পলল তটভূমি

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার গলিগুলো মাঝে মাঝে হাতের রেখার মতো মনে হয়। কোথাও স্পষ্ট, কোথাও জট পাকান আবার কোথাও এতটাই অস্পষ্ট যে বোঝা দায় রেখাটা আদৌ আছে কিনা। দিদির হাতের রেখাগুলো অবশ্য আজ আর গলিঘুঁচির মানচিত্র মনে হচ্ছে না। অপূর্ব আলপনায় ঢেকে গেছে। অনন্যা আর চিত্রা দুহাত ভরিয়ে মেহেন্দি পরিয়ে দিয়েছে দিদিকে। পালককেও জোর করেছিল। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস দূর থেকেই ভালো লাগে। পালকের মেহেন্দির গন্ধটা একেবারেই সহ্য হয় না। আজকাল বাঙালি বিয়েতে এই মেহেন্দি সজ্জাটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া হাত গুটিয়ে বসে থাকার মতো সময় এখন পালকের নেই। তাকে ক্রমাগতই ওপর নীচ বাড়ি বাগান দৌড়তে হচ্ছে। তাছাড়া যা পাঁচ বছর ধরে নিজেকে গুটিয়ে রাখার নিচ্ছিদ্র প্রয়াসে সে ভীষণভাবে সফল। আজ অবশ্য সে প্রায় বোধশূন্য। সবার জন্য ঘোলের সরবত তৈরি করতে করতে নিজেকে একটু যাচাই করার চেষ্টা করছিল পালক! সে বেশ ঠিকঠাক আছে। গত বছর ডিসেম্বরে বাবার দ্বিতীয় বার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হলো। প্রথমটার সূচনা ততটা তীব্র ছিল না। কিন্তু ডিসেম্বর মাসেও বাবার ওই প্রচণ্ড ঘামে পান্ডুর হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবতেই পালকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। তারপর থেকে বাবার দায়িত্ব সে নিজেই নিয়ে নিয়েছে। দায়িত্ব নেওয়াটাও যেন একটা অভ্যাস। তাদের এই তিনতলা বনেদী বাড়িটার অঙ্ক কষে ভাগ করা আছে দুই পিসি আর বাবার মধ্যে। কিন্তু বাড়ির দায়িত্ব পালনের ভাগীদার শুধুই তার বাবা — উৎপল মিত্র। বাবা বাড়ির সামনের বাগানটায় একটা চেয়ারে বসে বিমলকাকুর সঙ্গে কথা বলছে। বিমলকাকু বাবার বহুদিনের বন্ধু, একই স্কুলে পড়েছিল দুজনে। মাঝে অবশ্য কাকু ওঁদের গ্রামের বাড়িতে চলে যান। পালক অবশ্য জ্ঞান বয়স থেকে বিমলকাকুদের কৃষ্ণেন্দুদাদের বাড়ির দোতালার বাসিন্দা হিসেবেই দেখেছে। পালক ঘোলের সরবতটা বাবার হাতে দিয়ে বলল,

—দুটো বিস্কুট খেয়ে খাও বাবা।

—নারে এটাতেই হবে।

—সারাদিন কিছুই খেতে পারবেনা না কি? এ আবার কী নিয়ম।

—নিয়ম নয়রে সংস্কার।

—পালক, তোর বাবাকে খাওয়া, শরীর বিগড়ে গেলে নিয়মটা পুরোটাই জলে যাবে।

পালক যখন বাবাকে খাইয়ে দিদির ঘরে ঢুকলো তখন সেখানে পায়ের পাতা ফেলার জায়গা নেই। যতধরনের ও বয়সের আত্মীয় হতে পারে কাউকেই বাদ দেয়নি বাবা তার বড়ো মেয়ের বিয়েতে। পাখির গয়না শাড়ি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর আলোচনার মধ্যেই পালক সাবধানে পাখির কাছে গিয়ে বলল,

—একটু ঘুমিয়ে নিবি দিদি?

—না। কেন?

—একটু রেস্ট নিলে ভালো হতো।

এ ঘরের হৈহট্টগোলটা একটু বেশিই কানে লাগছিল পালকের। সে অত চেঁচিয়ে গলা তুলে কথা বলতে পারে না বলেই বোধহয় এই জনসমাগমটা তার কাছে অকারণ চিৎকারের আসর মনে হচ্ছিল। আর যেখানে সে গলা তুলতে পারত, সেখানে আর তার কোনো দিনই পৌঁছন হবে না। পালকের মামতো বৌদি জিজ্ঞেস করল,

—কোথা থেকে কিনলিরে শাড়িগুলো?

—গয়না কি সব বানানো হয়েছে? সোনার যা দাম!

বোদ্ধা মামাতদাদা তার বৌয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলে উঠল,

—ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট!

বৌদি তেড়ে উঠেছিল, কিন্তু শ্বশুরকূলের প্রাধান্য থাকায় চিমটি কাটল,

—পাখি তোর বরাত জোর আছে। এত কান্ডের পরও একটা বেশ দমদার ইঞ্জিনিয়ার পাত্র ধরতে পেরেছিস। আমাদের মতো কিপটে বরের পাল্লায় পড়লে লাইফটা হেল হয়ে যেত!

পালক থমকে গিয়েছিল। ...এতকান্ডের পরও কথাটা যে কীভাবে কখন একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলতে পারে সেটা এরা জানেনা। অথবা জানে কিন্তু পরিনতিটা এদের ভাবায় না। এরা কথা বলে শুধু মানুষকে কষ্ট দিতে! মানুষকে দুর্বলতায় ঘা দিয়ে যে অনেকেই ভীষণ আনন্দ পায় সেটা খুব অল্প বয়স থেকেই জেনে গেছে পালক, তাই বলে আজকের দিনেও এরা রেহাই দেবেনা তাদের? অনেক তো সময় পেয়েছে ওরা এবং তার সদ্ব্যবহারও করেছে যথেচ্ছভাবে। দিদিকে নিয়ে নানা কথায়, ব্যবহারে দিনের পর দিন আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে গেছে তাদের পরিবারকে। ভ্যাগিস বাবা বা মা কেউ এই ঘরে নেই। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও এরাই ভুলতে দেবেনা পাঁচ বছর

আগেকার পাখির নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোকে। কেন যে এরা আসে?

—এ্যাই পালক ফুলশয্যার শাড়িটা দে। হাত পা গুটিয়ে বসে আছিস কেন?

—তোমরাই তো সামলে নিচ্ছ সব। তাছাড়া আমি সবচেয়ে দামি দায়িত্বে আছি। মাসতুতো দিদি তিতির পাখির ফুলশয্যা শাড়িটা মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে বলল,

—তোর জামাই বাবুর দায়িত্ব?

—নাঃ সেটা তোমাদের ওপরই ছাড়লাম! অতো দামি দায়িত্ব আবার আমি সামলাতে পারব না!

—কী হিংসুটেরে তুই! আমরা না হয় এই বিয়ের কদিন। তারপর তো তোর রইলই।

—তা যা বলেছ।

পাখি হঠাৎ একটু ধমকেই উঠল, যদিও গলার স্বর নামিয়ে বলল,

—সবজায়গাতে ইয়ার্কি করিস না পালক! এখানে বড়োরাও আছে।

বড়োপিসির কান যে এত প্রখর তা এরকম স্থানকালপাত্রে ছাড়া বোঝা যায় না। একটুও সময়ের অপচায় না করে বড়োপিসি বলেউঠল,

—যাক। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমাদের পাখি আর উড়ে উড়ে বেড়াবেনা, তার লঘুগুরু জ্ঞান হয়েছে। হাজার হোক এবার গিন্নি হতে চলল তো!

দিদির লালচে আভা ভরা সুন্দর মুখটায় যেন ধূসর ছাই মাখিয়ে দিল কথাগুলো নিমেষের মধ্যে পালক জানে দিদি এখন কী কী করতে পারে এবং দিনে কীভাবে সামলাবে সে। বাবা হয়ত আরও শান্ত হয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু একমাত্র পালকই বোঝে এরকম শান্ত হয়ে যাওয়াটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। আর কতোবার সে সামলাবে দিদিকে? আর কতবার ভয় পেতে হবে তাকে হৃদযন্ত্রটার কাছে?

—এই পালক, পাখিদিকে নিয়ে ওপরে ঠাকুর ঘরে যা কাকিমা বলে পাঠাল।

কথাটা শেষ হতে না হতেই হাওয়া হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দুদা। সেজমাসি ফিসফিসিয়ে তার ছোটো ভাই বৌকে বলে উঠল—

—লোফার একটা! উৎপলের তো কোনোকালেই কাণ্ডজ্ঞান নেই, তনিমারও কি থাকবে না? এই বিয়ে শাদির বাড়িতে ওই লোফারটাকে ডাকার দরকার কী ছিল?

ছোটোমামি আড়চোখে পালককে দেখেই বোধহয় কথাটা ঘুরিয়ে দিল,

—ছাড়না সেজদি। পাড়ার মানুষের যাতায়াত তো থাকবেই।

সেজমাসিরা আর কী কী বলে মুখের ও মনের আরাম করেছিল জানে না পালক। সে দিদিকে নিয়ে তিনতলায় ঠাকুর ঘরে নিয়ে এসেছিল। পালক ওকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল।

—এ্যাই দিদি! এমন করিস না প্লিজ। এখানে আমি ছাড়া কেউ আর নেই।

পাখি ভীষণ অস্থির হয়েই বলে উঠল,

—তুই চলে গেলেই ওই ওরা আবার আসবে!

—দিদি। দ্যাখ! দ্যাখ! এই যে আমি! আমি কোথাও যাব না। বলেছিলাম না, সবচেয়ে দামি দায়িত্ব আমার ওপর।

পাখি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। ওকে আস্তে আস্তে মেঝেতে বসিয়ে একটু জল খাওয়াল পালক। ও বুঝতে পারছিল দিদি এবার শুয়ে পড়বে। এগুলো তার দিদিকে সামলানর অভ্যস্ত স্তর। ঠাকুর ঘরের পাশেই পালকের নিজস্ব ঘর। সেখানে ডাঁই করে রাখা দিদির বিয়ের জিনিসপত্র।

—ওকে তোর ঘরে শুইয়ে দে।

মার গলায় চমকেই উঠেছিল পালক। মার মুখটা ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। মুখটায় কোনো বিষাদ খুঁজে পেল না পালক বরং একটা বিরক্তির আভাস রয়েছে। দিদিটা কত কিছু হারাল এবং ভবিষ্যতেও হয়ত হারাবে। দিদি অনেককেই দায়ি করিয়ে দিতে পারে তার এই অবস্থার জন্য, কিন্তু ও নিজে বুঝেও বোঝে না। দায় এখানে একমাত্র তার নিজেরই। পাখিকে নিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল পালক। দিদি ওর হাতটা চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়ছে। পালকও যদি এরকম ঘুমিয়ে পড়তে পারত! তার অতিপরিচিত গলা ব্যথাটা কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে। কান্না তার আসে না, শুধু যন্ত্রনাটা রেখে দিয়ে যায়!

।। দুই।।

অনন্যা চট্‌পট্ সাজটা শেষ করছিল। তার সাজতে খুব ভালো লাগে। তাই সময়ও লাগে বেশ। পাখিদিকে সাজাতে সাজাতে তার আর চিত্রার অনেকটাই সময় লেগে গেছে। তাই নিজেদের সাজের জন্য বেশি সময় পায়নি ওরা। চিত্রার অবশ্য এ ব্যাপারে হেলদোল নেই। ও কোনো কালেই সাজুনে নয়। শুধু খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চুলটা আলতো করে বাঁধা আর ঠোঁটে একটু লিপস্টিক। টিপ না কি ওর কপালে থাকে না। আর লাইনার লাগাতে গেলে প্রায় কেঁদে ফেলে। পালক এরই মধ্যে সেজে বেরিয়ে গেছে। অনন্যা বলেছিল।

—মাথায় একটা গোলাপ লাগা পালক।
—ধূর। মাথাটাকে ফুলের টবের মতো লাগে!
—তুই না ভীষণ আনরোমান্টিক।
—দ্যাখ, সত্যিকথা বলতে কি বিয়ে বাড়িতে লোক কনের আর নিজের সাজটাই দ্যাখে। অন্যেরটা দ্যাখে না।
—তোর মাথা! কত ছেলে ঝারি দিয়ে লাটখায় জানিস?
—সে না সাজলেও খায়!

বলেই পালক ব্যস্ত হয়ে কী একটা কর্মভার সামলাতে চলে গেল। অনন্যা চিত্রাকে বলল,

—মেয়েটা ক্ষেপীই রয়ে গেল! নিজের দিদির বিয়েতে ওরই তো সবচেয়ে বেশি সাজার কথা!

চিত্রা বলল,

—বেশি পরিশ্রম করলে কি আর সাজতে ইচ্ছে করে!

চিত্রার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে ঝড়ের মতো ঢুকলো আবীরা। ঝড়ও যে এত আলো ছড়াতে পারে আবীরাকে না দেঁখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এসেই বলে উঠল,

—কী রে, তোরা এখনও গ্রীনরুমে?
—এটা একটা আসার সময় হলো? তোর না সকাল থেকে আসার কথা!
—ওটা শুধু কথার কথা। এই ভীড়ে বড্ড একঘেয়ে লাগে।
—ও। আমরাও বুঝি এখন একঘেয়ে হয়ে গেছি?
—চিরকালই ছিলিসরে।

চিত্রাই আবীরাকে থামাল,

—থাম না বাবা! এত ঝগড়ুটে কেনরে তোরা?
—ঝগড়াটা করতে দিচ্ছিস কোথায়?
—খামোখা ঝগড়াই বা করবি কেন?
—উফ্! তোর এই বুকিশ জ্ঞানগুলো বড্ড বোরিং রে চিত্রা।
—জানি। ঝগড়া করে এসেছিস কারোর সঙ্গে?
—না। তবে মেজাজটা খাট্টা হয়ে আছে।
— কেন রে?

আবীরা প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল,

—জানিসই তো পালকের সঙ্গে আমার মোটেই পটে না। পৃথিবীর সব দুঃখ যেন ওর একারই। আজকেও ঢোকার মুখে দেখলাম কেমন প্লেট মুখ করে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করছে। মিনিমাম্ ওয়ার্মটুকু দেখাল না!

অনন্যা তার শেষ রূপটান দিয়ে ফেলেছে। আবীরার কথাগুলো ভালো লাগছিল না চিত্রার। আর কেউ জানুক বা না জানুক সে তো জানে পালক কীভাবে শীতল হয়ে গেছে। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল চিত্রা,

—মধুরাদি কোথায়?
—কনের পাশে।

বিয়ে বাড়ি তখন পূর্ণ উদ্যমে সেজে উঠেছে। বরপক্ষের তত্ত দেখতে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কী দামি দামি জিনিসরে। আর কী সুন্দর করে সাজানো। পালকের মামাত দাদা তার স্বভবোচিত বিজ্ঞতায় বলল,

—বাজে খরচ। যত্তসব দেখনদারি হয়েছে আজকাল।

বৌদি এবার আর সুযোগটা নষ্ট করল না,

—তাই? আমার বাড়ির তত্তের ব্যাপারে তোমাদের তো তা মনে হয়নি। বরং বেশ কায়দা করে তোমার বোনেরা ভালো জিনিসগুলো সরিয়েছিল।

কথাগুলো খুব সাবধানী গলাতে বললেও পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রা, অনন্যা, আবীরা সবই শুনতে পেল। বিয়ে বাড়ি আসার এই একটা মজা। বেশ খোরাক পাওয়া যায়। কথাটা আবীরা চিত্রাদের বলতেই যাচ্ছিল পালককে আসতে দেখে চুপ করে গেল। পালককে সত্যিই ভীষণ কাহিল দেখাচ্ছে— শরীরের ওপর ধকল গেলে এমন কাহিল দ্যাখায় না। ওকে সুন্দর লাগছে, কিন্তু আবীরা জানে পালক আরো অনেক বেশি সুন্দর তবে কি তার মনের খটকাটা সত্য? চিত্রা সব জানে কিন্তু মুখ খুলবে না। বছর খানেক আগেও দিদির সঙ্গে পাখিদির মাঝরাত অব্ধি কথা হত ফোনে। এক আধদিন আড়িপাতার লোভটা সামলাতে পারেনি আবীরা। ব্যাপারটা বেশ জটিল, আবার অন্যভাবে দেখলে টিপিকাল হিন্দি সিনেমার ন্যাকা স্ক্রিপ্টের মতো! দিদিদের ব্যাচমেট কনিষ্কদা তাদের সায়েন্স সাবজেক্টগুলো পড়াত। পালকদের বাড়িতেই পড়তে আসত সে, অনন্যা, চিত্রা আর দুটো হাঁদা ছেলে। আবীরা অবশ্য মাধ্যমিক পর্যন্তই পড়েছিল, নাইন-টেনে দুবছর। এইচ এস এ ও হিউম্যানিটিস নিয়েছিল বলে তখন আর আসত না। আবীরা প্রথম

থেকেই বুঝতে পারছিল একটা কিছু চলছে। অ্যাডোলেসেন্স তো বোকা বোকা প্রেমকাহিনি তৈরি করার জন্য মুখিয়েই থাকে। এক্ষেত্রেও পালকের সঙ্গে সেরকমই কিছু একটা ঘটে থাকবে বোধহয়। আবীরা টেনের শেষ থেকেই বুঝতে পারছিল কণিষ্ক নামক তীরের লক্ষ্য পাখিদের চোখ সে এরকম অনেক কিছুই টের পায়। কেন পায়, সেটাই সমস্যা — বহু চিন্তা ভাবনা করেও এর যুক্তিসঙ্গত কারণ সে বার করতে পারেনি। হঠাৎ একটু অতিরিক্ত রকম চেঁচামেচি, উলু ইত্যাদি শব্দে বোঝা গেল বর - বউ ছাতনা তলায় বসেছে। ওরা সবাই ভীড়ের মধ্যে উঁকি ঝুকি দিয়ে পাখিদি, আর কণিষ্কদার মালাবদল দেখছিল। মালাগুলো প্রথমে পালকই ধরে ছিল, যথাসময়ে বরকণের হাতে দেবার জন্য। আবীরা দেখল ওর দিদি কখন যেন পালকের পাশে দাঁড়িয়ে মালাগুলো নিজের হাতে নিয়ে নিল। পালক একবার আবীরার দিদির দিকে তাকাল, তারপর ভীড়ে মিশে গেল। হৈ হট্ট গোলে মোবাইলটা যে বাজছে, সেটা বুঝতে পারেনি আবীরা। এখন ভাইব্রেশানটা টের পেয়ে ভীড় কাটিয়ে একটু নিরিবিলিতে এসে ফোনটা তুলল সে—

—এ কী? তুমি ফোন করেছ আসরে?

— কেন?

—একবার এসোই না।

—আসব না।

—তবে ডানদিকে মুখটা একবার ঘোরাও, একটা দারুন জিনিস দেখতে পাবে।

আবীরা কৌতূহলবশতই ডানদিকে মুখটা একটু ঘোরাল, কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেল না। খুব বিরক্ত লাগছিল তার।

—কী হচ্ছে কী? কিছুই তো দেখতে পেলাম না।

—আমি পেলাম।

অসহ্য। এরকমভাবে ছবি তোলাটা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না আবীরা। যত্তসব ন্যাকামি। ফোনটা কেটে দিয়ে সে আবার চিত্রাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

।। তিন।।

চিত্রার নিজের ঘরটা তার সবচেয়ে আপন। যদিও ঘরটাকে সঠিক অর্থে তার নিজের ঘর বলা যায় না। উত্তর কলকাতার এই বাড়ির দোতলায় যখন তারা ভাড়াটে হয়ে এসেছিল তখনও তার বোধোদয় হয়নি। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে এই ভাড়া বাড়িতে। অনেক বোধেরও উদয় হয়েছে, কিন্তু এই ঘরটাকে নিজের ঘর ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবতেই পরে না। তার পড়ার টেবিলের সামনের জানালা দিয়ে দেখা যায় একটা আম আর নিমগাছ বেশ বন্ধুত্ব করে সেই কবে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মা ডেকে গেছে অনেকক্ষণ। তবু নভেম্বরের আদুরে শীত শীত ভাবটা কাটিয়ে চিত্রার উঠতে ইচ্ছে করছে না। সকালের রোদে গাছ দুটোর ছায়া খেলা দেখে যাচ্ছিল সে। বন্ধুদের মতো তার ঘরটা অত সাজান গোছান নয়, কিন্তু চিত্রার চোখে এত সুন্দর একটা ঘরও আর কোথাও সে খুঁজে পায়নি। ওই দুটো গাছ আর ঘরের লাগোয়া মাধবিলতার ঝাড়সমেত ছোট্ট ব্যালকনিটাই এই ঘরের অন্তর্সজ্জা বিন্যাস করে দিয়েছে। নাহলে একটা আলনা, খাট, পড়ার টেবিল চেয়ার ছাড়া তার ঘরটিতে আর কোনো আসবাবের স্থান হয়নি। শুধু তার ঘরের দেয়াল আলমারি দুটোই বইয়ে পরিপূর্ণ। দাদা তাকে এবার একটা আলমারি কিনে দেবে বলেছে। তাতে অবশ্য মন্দ হয় না, কিন্তু ঘরটা ছোটো হয়ে যাবে। বাবা বলে।

—'ঘরটুকু' শব্দটার মধ্যে 'টুকু' অংশটা সবচেয়ে সুন্দর। ওটা ঠিক স্কোয়ার ফিটের মাপে আঁটে না।

—তুমি না বাবা মাঝে মাঝে হিব্রুতে বাংলা বল।

—এখন বুচ্ছিস না, আরেকটু সময় যেতে দে, নিজের চিন্তাভাবনাগুলোকে খোলামেলা কর। একদিন ঠিকই বুঝে যাবি।

আজকাল সে যেন বাবার কথাগুলো অনেকটাই বুঝতে পারে। আবার বেশি ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। মা আবার ডাকছে, নাঃ এবার আর না উঠে উপায় নেই। তাদের পাশাপাশি তিনটে ঘর, ঘরগুলোর সামনে স্কুলবাড়ির মতো টানা বারান্দা। সিঁড়িদিয়ে উঠেই, প্রথম ঘরটা দাদার, মাঝেরটা তার ও শেষের বড়োঘরটা মা - বাবার, বারান্দাটার শেষ কোনয় একটা প্লাইউডের পার্টিশান দিয়ে রান্নাঘর করা হয়েছে। সামনের বারান্দাটায় বাবা ছোটো ছোটো টবে নাম - না - জানা গাছ লাগিয়েছে। তাদের ডাইনিং বা ড্রয়িংরুম নেই, আছে এই বাগান - বারান্দা। ছোটো মোড়া, ছোটো টি টেবিলেই তাদের চা থেকে দুপুরের খাওয়া সারা হয়। লোকজন এলে শতরঞ্চি বিছিয়ে পাত পেড়ে খাওয়ান হয়। এই বাগান - বারান্দাটাই তাদের ডাইনিং রুম। আগে তো পাখাও ছিল না ওখানে। এখন আছে...তবু না থাকলেই যেন বাবা বেশি খুশি হত। দাদা ডাক্তারি প্রাক্টিস্ করার পর থেকে ধীরে ধীরে কিছু নির্দোষ প্রযুক্তি ঢুকছে তাদের বাড়িতে। বছর দুয়েক হল দাদা তার ঘরে একটা কম্পিউটার আমদানি করেছে এবং সেইসূত্রে ইন্টারনেটও। চিত্রা এই অনিবার্য যোগাযোগ মাধ্যমের বশীভূত হলেও, ইন্টারনেট, তাকে নির্ধারিত সময়ের বেশি

হিসেব করে নির্ধারণ করে নিয়েছে। ছোটোবেলা থেকে হিসেব নির্ধারণ করতেই সে অভ্যস্ত। বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতেন। মোটামুটি ভদ্রস্থ পদে। কিন্তু যাপিত জীবনের পালাবদল বুঝিয়ে দিল, ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে হলে একমাত্র সম্বল তারকেশ্বরে তাদের ভাগের 'জমিটা' বিক্রী করতে হবে। দাদা ডাক্তার হলো। বলতে নেই, তাদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা হলেও কমেছে দাদারই জন্য। তবু চিত্রার কোথাও যেন মনে হয় তার অবসরপ্রাপ্ত বাবা কি হেরে গেল?

চিত্রাদের বাড়িওয়ালারা তিনতলায় থাকেন। অবশ্য প্রভামাসিরা যে বাড়িওয়ালা সেটা ওরা কেউই তেমনভাবে মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তিনতলায় প্রভামাসিদের একটা ঘর অব্যবহৃত পড়েছিল অনেকদিন। চিত্রা এখন সেই ঘরে সমস্ত জুড়ে সকাল সন্ধ্যা ছাত্র পড়ায়। একটু সংকোচের সঙ্গেই সে আলাদা ভাড়া দেবার কথা বলেছিল মাসিকে। প্রভামাসি খুব জোর ধমকে উঠল—

—খুব পেকেছিস, না? পয়সার কথা বলতে তোর সাহস হলো কী করে? কোলে পিঠে মানুষ করলাম এখন উনি ভাড়া দেবার কথা বলছেন? তোর মেসোমশাই শুনলে তোকে কানধরে ওঠবোস করাবে।

চিত্রা আর কথা বাড়ায়নি। খুব অল্পবয়স থেকেই সে টিউশানি করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ানতে বাবার ভীষণ আপত্তি। তাই তাকে এই ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে। যতই কাছের মানুষ হোক না কেন, তার কারোরই ফেবার নিতে ভালো লাগে না। ওর নিজের ঘরটা বেশ ছোটো। ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে পরিসরের বাস্তবানুপাতিক সম্পর্ক। পড়াতে চিত্রার খুব ভালো লাগে। কিন্তু ইদানীং এই নির্বোধ ছাত্র ছাত্রীদের অতিরিক্ত পাকামি তার এই ভালোলাগাটায় দরকচা লাগিয়ে দিচ্ছে তারই মধ্যে অবশ্য দু - চারজন মনের মতো স্টুডেন্ট পেয়ে যায় চিত্রা। আজ সকালে পড়ান শেষ করে নিজের ঘরের চেয়ারটায় বসেছিল সে। এ সপ্তাহে শনি - রবিও পড়াতে হবে। গত সপ্তাহে পাখিদির বিয়ের জন্য চারদিন পড়াতে পারেনি। এরা শিশু হলেও দিদিমণির দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওয়াকিবহাল। পড়ার টেবিলে বসেও পড়ায় মন বসছিল না চিত্রার। পাখিদির বিয়েটা খুবই ভালো হয়েছে, অন্তত যাকে সবাই 'ভালো বিয়ে' বলে।

পালকদের সঙ্গে চিত্রাদের সম্পর্কটা এতটাই গভীর যে ওদের পরিবারের কোনো তথ্যই বোধহয় চিত্রার অজানা নয়। ছোটোবেলা থেকেই সে পাখিদিকে দেখে এসেছে, তার আর পালকের বড়ো হয়ে ওঠা তো একইসঙ্গে। পাখিদিকে ছোটোবেলায় খুব ভালো লাগত চিত্রার। কী সুন্দর সুন্দর গল্প বলত পাখিদি। ভীষণ হুজুগে ছিল, সঙ্গে একটু ক্ষেপিও। কিন্তু এখন মনে হয়, পাখিদির ছোটোবেলা থেকেই একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ছিল। প্রত্যেক মানুষেরই আবেগ থাকে। কিন্তু সেই আবেগটা যদি ধ্বংসাত্মক হয় তাহলে সেটাকে বোধহয় স্বাভাবিক বলা যায় না। ওরা তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। হঠাৎ একদিন পাখিদি ভয়ঙ্কর রকম ফেমিনিস্ট হয়ে উঠল। ফেমিনিস্ট হওয়াটা দোষের নয়, কিন্তু চিত্রা দেখেছে যারা নারীবাদ নিয়ে হঠাৎ করে উঠে পড়ে লাগে তারা নারীকে বাদ দিয়েই আর বাকি যা যা করা বা করার নয় সেটাই করে। কোনোদিকেই ভারসাম্য রাখতে পারে না। পাখিদিও পারেনি। কোন এক অজানা আবেগে পাখিদি সবার সামনেই ঘোষণা করল সে জীবন সঙ্গিনী পেয়ে গেছে। তাদের মতো মধ্যবিত্ত পাড়া ও পরিবারে এ খবর ছড়াতে বেশি সময় লাগল না। মধুরাদি, কণিষ্কদা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। পাখিদি বুঝল না। ওরকমই পাখিদি। হুজুর্ক আর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। অবন্তীদির প্রতি পাখিদির একটা মোহ ছিল এবং শুধুমাত্র মোহ দিয়ে সম্পর্ক রচনা করা যায় না। সত্যিই যে ওদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তার প্রমাণ পাখিদির তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা এবং সেটা একটি ছেলের জন্য। সেদিক থেকে দেখলে পাখিদিই অবন্তীদিকে ডিচ করেছিল। ইউনিভার্সিটির সেই ছেলেটির প্রেমপত্রের ভাষায় পাখিদি তখন উন্মত্ত। যাইহোক, সেই মহার্ঘ্য পাত্রপ্রেরকের সঙ্গে পাখিদির সম্পর্ক ছিল বছর খানেকের — তারই মধ্যে ভ্রূণহত্যা করতে হয়েছিল পাখিদিকে। ফল অবশ্যম্ভাবী আবার আত্মহত্যার চেষ্টা ও বিফল হওয়া। সাইকোলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট কিছুই বাদ রাখেনি উৎপল কাকু। শেষ পর্যন্ত যে পাখিদিকে সামলাল সে কণিষ্কদা। কাকুর সেইসময়ই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকটা হয়।

পালক চিরকালই ভীষণ চাপা, অদ্ভুতুড়ে বাস্তববাদী। বয় সন্ধি থেকে কণিষ্কদার প্রতি যে অন্তসলিলা অমরাবতী সে তৈরি করেছিল, তার খবর চিত্রা ছাড়া সম্ভবত আর কেউই তেমনভাবে জানে না। আর যাকে জানার জন্য পালকের চোখের ছবিটাই বদলে যেত সে কি কিছুই টের পায়নি? অসম্ভব। চিত্রা জানে কণিষ্কদা সবই বুঝতে পারত। এমনকি কখনও কখনও অকারণ প্রশ্রয়ও দিত। তখন বোধহয় ইলেভেনে পড়ে তারা, কণিষ্কদা একদিন হঠাৎ বলে উঠল।

—পালক, তোর গলার স্বর এত আস্তে যে তোর প্রব্লেমগুলো শুনতেই পাই না। তুই আমার পাশের চেয়ারটায় বোস তো।

ওরা সবাই তখন কী পেছনে লাগত পালকের। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে মিলে গেল শুধু একটাই কথার কিছুটা অংশ... 'তোর গলার স্বর এত আস্তে যে প্রবলেমগুলো শুনতেই পাই না।' ..বাকিটা মিলিয়ে গেল। পালকের গানের গলা অসাধারন বললেও কম বলা হয়। কণিষ্কদা প্রায়ই পালককে গান গাইতে বলত,

—খাসা গলাটা তোর। একটা মন ভালো করা রবীন্দ্রসংগীত গাইবি?

চিত্রা দেখেছে, পালক তখন গান খুঁজে পেতনা। আর যখন পেত তখন ওরাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতো। পাখিদিকেও সেসব সময়ে ডেকে আনা হত। ডিপ্রেসানটা যদি এতে একটু কাটে। ডিপ্রেশান কাটল পাখিদির, বেচারি পালক টেরও পেলনা, কখন কীভাবে তাকে নানা রকম প্রেসক্রিপশান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন টের পেল, তখন উচ্চমাধ্যমিকের আর একমাস বাকি। তারপর পাখিদির সুস্থ হয়ে উঠতে একবছরের বেশি সময় লাগল না। কণিষ্কদা নিজের বাবা মা-র সঙ্গে হবু বউ ও কাকু কাকিমার আলাপ করিয়ে নিয়ে গেল। কণিষ্কদা বেশ শক্ত হাতেই হাল ধরেছিল। মাঝের চার বছরে পাখিদি কোনো অস্বাভাবিক কান্ড ঘটাল না। ইউ কেতে পাকা চাকরি নিয়ে গত সপ্তাহে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। আর এই ডালিমকুমারের গল্পটা পালক সযত্নে লুকিয়ে রাখল, আর এমনভাবে লুকিয়ে রাখল যেন রূপকথা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়, শুধু চিত্রার কাছে ধরা দিত পালক। এখনও দেয়। তবে কতটা ধরা দেয় জানেনা চিত্র। চিত্রা একবার ওর স্বভাববিরুদ্ধ কিছু প্রশ্ন করেই ফেলেছিল পালককে,

—কী করে পারিস?

—একবার পেরেছি বলেই হয়ত বারবার পারি। দিদি কোনোদিনই সুস্থ হবে নারে। একের পর এক ভুল করেছে ও। মানুষ নিজের কাছে এতটা জবাবদিহি করতে পারেনা।

—আর কণিষ্কদা?

—সে যে নিজেই শাস্তিটা মাথা পেতে নিয়েছে।

—মানে? তোর কাছে ক্ষমা চেয়েছে?

—তাতে ওর লাভ কোথায়?

—তাহলে?

—দিদিই ওর সবচেয়ে বড়ো শাস্তি। জানি, কথাটা খুব নিষ্ঠুরের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু সত্যিটা যে এর থেকেও বেশি নিষ্ঠুর।

—তবে কেন এই সত্যিটা ঘটতে দিলি?

—বাবার জন্য। ওই ম্যাসিভ অ্যাটাকটা থেকে বাঁচান যেত না রে মানুষটাকে। আমার বোকা মা-বাবা এই বিশ্বাসেই বেবিহয় বেঁচে আছে, যে তাদের বড়ো মেয়েকে আমি আর কণিষ্ক ছাড়া কেউ সুস্থ জীবন দিতে পারতাম না।

।। চার।।

ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। কিছু মুখ আছে যাদের একমাত্র ছবিতেই সুন্দর লাগে, ভীষণ ভালো লাগে, শুধু ছবির মুখটাকেই ভালোবাসা যায়, প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে করে। এই মুখটার খান পাঁচেক ছবি সেদিন যে তুলেছে। বিয়ে বাড়ির ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ একলা হয়ে যাওয়া একটা মুখ — অদ্ভুত সুন্দর, সবাই বলে আবীরা নাকি দারুন দেখতে। কিন্তু একমাত্র ক্যামেরার লেন্স ছাড়া কৃষ্ণেন্দু সেই সৌন্দর্যটা খুঁজে পায় না, বড্ড উগ্র মনে হয়। উগ্রতা সৌন্দর্যকে হয়ত ধারাল করে, চটক দেয় কিন্তু স্নিগ্ধতা দিতে পারে না। সেটা একমাত্র আবিষ্কার করতে পারে কৃষ্ণেন্দুর ক্যামেরা।

—কী রে? আর কত ছবি নিয়ে আদিখ্যেতা করবি? দোকানটাও কি বুড়ো বাপই খুলবে?

প্রভাবতীর খরবাক্যে ঘোরটা কেটে গেল কৃষ্ণেন্দুর। শুধু মাকে কেন, কাউকেই সে বোঝাতে পারবেনা যে কৃষ্ণেন্দু সেন ছবি তোলে না, মানুষের মুখের অজানা ভাস্কর্য আবিষ্কার করে ক্যামেরা দিয়ে। ঘটনাক্রমে নারীমুখের ছবি বেশি থাকায় তার নামে এ অঞ্চলে বেশ কুখ্যাতি আছে। কৃষ্ণেন্দু এও শুনেছে, সে নাকি মেয়েদের ছবি তুলে কম্পিউটারে সেগুলোকে শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে অ্যাড এজেন্সির কাছে বিক্রি করে। অভদ্রতার মধ্যে সে না বলে ছবি তোলে। কারণ মেয়েদের স্বভাবজ ন্যাকামি সহ্য করে ছবি তোলানর জন্য রাজি করার ধৈর্য তার নেই। অনেকসময় সুযোগও থাকে ফলে চেনা অচেনা বহু নারীমুখের বিচিত্র সুন্দর ভাস্কর্য নিয়ে গর্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার আলমারিটা। মা বোধহয় উঁকি দিয়ে দেখেছে আবীরার ছবিটা। বলে উঠল,

—এটা চিত্রার বন্ধুটা না? এর ছবি তুই পেলি কোথায়?

—পাখিদির বিয়েতে।

—তা, শুধু এরই কেন? বিয়ের ছবিগুলো কোথায়?

—উৎপলকাকুকে দিয়ে এসেছি।

—এই মেয়েটার ছবি তোর কাছে কেন?

—মেয়েটা ছবি চায়নি, তাই।

—আমার কানে কিন্তু অনেক কথাই আসে কৃষ্ণ।

—আমারও আসে।

কৃষ্ণেন্দু আর দাঁড়াল না। দোকানটা খুলতে আজ সত্যি দেরি হয়ে গেছে। হেল্পার ছেলেটাও দুদিন আসবে না জানিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণেন্দু দোকানের সাটারটা টেনে তুলল। তাদের বাড়ির একতলার সামনের দিকে চারটে দোকান ঘর। তিনটে ভাড়া দেওয়া আর একটা তাদের নিজেদের ওষুধের দোকান। জ্যেঠু এই পৈত্রিক বাড়ির অংশ নেয়নি। সল্টলেকে জ্যেঠুর নিজস্ব ফ্ল্যাট। দোকানের অভ্যাস মতো ধূপ জ্বেলে কৃষ্ণেন্দু তার কেজো জগতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবীরারা তখন রাশি রাশি ওষুধের স্তুপ।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হয়ে গেল শীতটা এখনও তেমন পড়ল না। অসুখ বিসুখও বাড়ছে তাই। তাতে অবশ্য তার মতো ওষুধের ব্যবসায়ীর লাভই বেশি। মোবাইলটা বেজে উঠল। শাক্য জ্যেঠুর ছোটো ছেলে। বয়েসে তার থেকে বছরখানেকের বড়ো হলেও ওরা একেই অন্যকে নাম ধরেই ডাকে। শাক্য ক্যানিং এ একটা স্কুলে অঙ্কের টিচার। ছেলেটা খ্যাপাটে। ইচ্ছে করলে শাক্য আরও অনেক ওপরে উঠতে পারত। শাক্যর গলায় বেশ খুশির আমেজ,

—কী রে। তোর তো পাত্তাই নেই।

—সালা। নিজে কত আসিস।

—তাই তো বলছি এখানে চলে আয়। তোর সাবজেক্ট পাবি অনেক।

—পাগল। গডফাদার এ্যান্ড মাদার তাহলে একেবারেই খেদিয়ে ছাড়বে।

—ভালোই তো। এখানেই থেকে যাবি।

—বৈরাগ্য আবার কোথায় দেখলি?

—তবে কি বিরহ।

—নাহ্। অপগ্রহ।

—সেকিয়ে শাক্য। তুই আবার কবে থেকে গ্রহ - নক্ষত্র মানতে শুরু করলি? ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে ঠেকছে।

—কে বস্? এবার ঝোড়ে কাশ তো?

—স্ত্রী বা পুরুষ প্রজাতির কেউ নয়!

—মুখ খারাপ করবি না কৃষ্ণ। সত্যি বলছি চলে আয়, ভালো লাগবে।

—আমাদের বয়স কত হলো বলত?

—চিন্তা করিস না। তোর যে বয়েসটা দরকার সেটা দিব্যি আছে।

—রাখলামরে। চলে আসিস।

কৃষ্ণেন্দু ভেবে দেখেছে শাক্যকে সে কোনো ব্যাপারেই 'না' বলতে পারে না। তার কয়েক মাসের বড়ো জ্যেঠতুতো দাদাটির প্রতি ওর ভেতরে একটা সমীহ কাজ করে। একমাত্র শাক্যই তাকে কিছুটা হলেও বোঝার চেষ্টা করে। ছুটিতে কলকাতায় আসলে সল্টলেকের বাড়িতে দুদিন কাটিয়েই এখানে চলে আসে। জ্যেঠু রাগ করে। তবু শাক্য আধবেলার জন্য হলেও আসবেই। ওরা তখন বছর চার পাঁচের এদিক ওদিকে, তখনই জ্যেঠিমা হঠাৎ মারা যায়। তাই কৃষ্ণেন্দুর মা, মানে শাক্যর ছোটোমা ওর খুব দুর্বল জায়গা। প্রভাবতীরও পক্ষপাতিত্ব আছে শাক্যর প্রতি। ব্যাপারটা ছোটোবেলায় বেশ জ্বালালেও এখন উপভোগ করে কৃষ্ণেন্দুর। বড়দা আগে আসত মাঝে মাঝে। তখন তার ব্যাপারই আলাদা। বছরের বেশির ভাগ সময় বিদেশেই কাটায়। শাক্যই বলছিল, বড়দা নাকি কোন এক বিদেশিনীকে বিয়ে করতে চায়। জ্যেঠু সে শুনে তো অগ্নিশর্মা। বিদেশিনীকে পুত্রবধূ করতে জ্যেঠুর আপত্তি নেই। কিন্তু বড়ো পুত্রটি কেবল গ্রীনকার্ড পাবার উপায় হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে - এটা কুন্ডল সেন মানতে পারেননি। সেই নিয়ে বড়ো পুত্র ঋষভের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝামেলা চলেছে বহুদিন। কৃষ্ণেন্দুর বাবা বহুবার বাপ ছেলের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ফল অবশ্য বিশেষ কিছু হয়নি। শাক্য তো বলে ঋষভ এতদিনে নাকি তার উদ্দেশ্য সফল করেও ফেলেছে। সে এখন দস্তুরমতো এন আর আই। জ্যেঠুকে অবশ্য কিছু জানান হয়নি। এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কলকাঠিটা নাড়ছে মৈনাকদা, বড়দির বর। বড়দি আর বড়দার জন্যই জ্যেঠু অসুখে পড়েছিল। নিজের জেদে শরীরটাকে কষ্ট দিত। বিশেষ করে বড়দির বিয়েটাই জ্যেঠুকে ভীষণভাবে মানসিক আঘাত দিয়েছিল। জ্যেঠুর কন্যাটিযে এত গোছান তা জানা ছিল না কৃষ্ণেন্দুর। জাহ্নবী সেন ডানাকাটা পরীনয়, লেখাপড়ায় অতি সাধারণ। কিন্তু জাহ্নারী সেনের মধ্যে ভীষণরকম একটা সেক্স অ্যাপিল আছে। আছে সাজগোজের নির্দিষ্ট কায়দা, হাঁটা চলা ও কথা বলার ভঙ্গী, অগুনতি রকমের হাসির উপযুক্ত প্রয়োগগুণ এবং প্রায় মর্মঘাতী চোখের ভাষা। তানাহলে মধুরাদির সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই ভেঙে মৈনাকদা জাহ্নাবী সেনের প্রেমে মশগুল হয়ে যেতে পারত না। তারপর একদিন কাউকে কিছু বলা কওয়া নেই— দুজনে রেজিস্ট্রি করে ফেলল। বেচারি মধুরাদিও জানতে পারল না। জ্যেঠু চিরকালই ম্যান অফ প্রিন্সিপল্। মেয়ের বন্ধু ও নিকটতম প্রতিবেশী ডঃ অমরজিৎ কাউড়ের মধুরাদিকে ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছে। কৃষ্ণেন্দু নিজেই দেখেছে মধুরাদি তার বন্ধুর থেকেও জ্যেঠুর সঙ্গেই গল্প করতে বেশি। জ্যেঠুর যে একটা অদ্ভুত স্নেহ আছে মধুরাদির ওপর সেটা টের সবাই। বড়দির আরও অনেক কিছুর সঙ্গে সেখানেও একটা ঈর্ষা

ছিল — তার শোধ নিল একটা সম্পর্ককে নষ্ট করে এবং একটা নষ্ট সম্পর্ক গড়ে। এটা জ্যেঠু কিছুতেই মানতে পারেনি। বড়দির বিয়েতে তাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। যদিও ঋষভ ও জাহ্নবী যারপরনাই চেষ্টা করেছিল। জ্যেটুকে রাজি করান যায়নি। শাক্যর ভাষায়,

—মার গয়নাগুলো ছাড়া দিদি আর বিশেষ কোনো লোকসান করেনি।

কৃষ্ণেন্দু এখন মাঝে মাঝে শাক্যর মধ্যে জ্যেঠুর ছায়া দেখতে পায়। ওদের তিন ভাই বোনের মধ্যেই শাক্যই যেন দলছুট।

—তোমার কি কানটা গেছে?

—ওহ্। তুই।

—তখন থেকে গালে হাত দিয়ে কী অত ভাবছ? তোমার শিল্পকর্ম অপূর্ব হয়েছে, সবাই বলেছে। এখন এই ছবিগুলোর ওপর একটু শিল্পিকর্ম দেখাতে পারবে?

কৃষ্ণেন্দু দেখল কতগুলো ব্ল্যাক এ্যান্ড হোয়াইট ছবি, তার মধ্যে কয়েকটা প্রায় বিবর্ণ। তার হাতে ছবিগুলো দিয়ে পালক বলল,

—বাবা বলেছে, ছবিগুলো যদি একটু মেরামত করে দাও ভালো হয়। এগুলোতে পাশ করলে ঠাকুমার ছবিটা দিয়ে যাব।

—ছবি কি আর মেরামত হয়রে, করলে সেটা অন্য ছবি হয়ে যায়। পুরনোটা আর পুরনো থাকে কি?

—বাহ্। বেশ দার্শনিকের মতো বললে বটে।

—কাকুকে বলিস ঠিক করে দেব। ওহ্। তোকে বলতে ভুলে গেছি আসলে কয়েকটা ছবি পরে ওয়াস করেছি তো। তোদের সেই সুন্দরী বন্ধুটা...আরে মধুরাদির বোনটার কয়েকটা ছবি আমাওর কাছে রয়ে গেছে। সেগুলো কি তোকেই দিয়ে দেব?

—আবীরার নামটা তুমি মোটেই ভোলোনি। সোজাসুজি বললেই পারতে ওর এক্সক্লুসিভ ছবিগুলো দিতে চাইছ।

—গাঁট্টা খাবি।

—ছোটোবেলায় অনেক খেয়েছি, এখন আর গাঁট্টা খেতে পারব না। তারচেয়ে ছবিগুলো দাও। সামনের সপ্তাহেই আবীরার বাড়িতে গেট - টুগেদার আছে আমাদের। তখন দিয়ে দেব।

—তোদের এক ফ্যাসান হয়েছে। গেট-টুগেদার।

—হিংসে হচ্ছে? তোমার নেমন্তন্ন নেই বলে?

—যাবি? না সত্যি মার খাবি?

—তোমাদের দোতলাতেই যাব। চিত্রাটার জ্বর হয়েছে।

—ভালো কথা মনে করিয়েছিস। সম্বিতদা দুটো ওষুধ পাঠাতে বলেছিল, তুই নিয়ে যা।

পালক ওষুধগুলো যখন ওর ছোট্ট পার্সটায় ঢোকাচ্ছিল কৃষ্ণেন্দুর মনে হল, এত সুন্দর আঙুল সে আগে কোথাও দেখেনি। ইস্ ক্যামেরাটা যদি সঙ্গে থাকত।

।। পাঁচ।।

রেবতীর সন্ধ্যেবেলাটা দু-তিন পেগ ভদকার সঙ্গে কাটে। ডক্টর অমরজিৎ কউড়ই তাঁকে প্রথম সুরাপানের স্বপ্নিল জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম আস্বাদ নেশায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগেনি। তখন নেশাটা ছিল প্রেমে অবগাহন। আরও কতো নেশাই তো ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। তারপর সব একে একে গেল, রয়ে গেল ভদ্কা। অমর কিন্তু নেশাটাকে প্রেমপর্বেই কাটিয়ে উঠেছিল। তাঁদের বিয়ের পর একবারের জন্যও স্পর্শ করেনি সুরার মাদকতাকে। তাঁর সব মাদকতা তখন রেবতীকে নিয়ে, আরও পরে মধুরাকে নিয়ে এবং সবকিছু ছাড়িয়ে ডাক্তারি নিয়ে। হাস্যকর। এই বিচিত্র নেশার স্তর পার করতে করতে অমরজিৎ কেড়ে নিয়েছিল রেবতীর স্বপ্নিল জগৎ। কাঁচের গ্লাসে স্বচ্ছ পানীয়টা যেন একা রেবতীরই রয়ে গেল। আজকাল মাঝে মাঝে তলপেটে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করেন রেবতী। স্থানীয় ডাক্তার ত্রিবিদ চ্যাটার্জ্জী তাঁকে সাবধান করেছেন বার কয়েক,

—এটা ছাড়তে হবে রেবতী দেবী।

—রেবতী দত্ত।

—সরি। আপনার ব্লাডসুগার বেশ হাই। অ্যালকোহল এক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে।

—দেখা যাক্।

কথা শোনেননি রেবতী। সন্ধ্যেবেলার এই ঘোরটা তাঁর বড়ো প্রয়োজন। পুষ্পরাগকেও জানাননি এ বিষয়ে কিছু। অবশ্য জানালেও পুষ্পরাগ কতটা কি করবে তাতে সন্দেহ আছে। পুষ্পরাগ দত্ত তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। বিশ্বভারতীতে পোয়েটিক্স নিয়ে গবেষণা করতেন পুষ্পরাগ। বিষয়গত সাদৃশ্য থাকায় তাঁদের বন্ধুত্ব রিসার্চের বাইরেও পদক্ষেপ

নেয়। গবেষণা এবং শিক্ষাবৃত্তি একই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলছিল। তখন মধুরার জন্ম হয়নি। বয়েসে ছোটো হলেও এই তরতাজা যুবকটির সঙ্গ বেশ পছন্দ করতেন রেবতী। কলকাতা থেকে যাতায়াত করে এখানে পড়ান সম্ভব ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই থেকে যেতেন তাঁর বাবার কাছে। অমরও আসত সময় সুযোগ বুঝে। সে অর্থে প্রথাগত সংসার জীবন কাটাননি তিনি। প্রথমবার সন্তানসম্ভবা হলেন রেবতী। অমর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এল। তাঁর পতিগৃহও তাঁকে যে খুব একটা আন্তরিক বাঁধনে ছড়াতে পেরেছিল, তা নয়। অমররা পাঞ্জাবী হলেও ওঁর ঠাকুরদার আমল থেকেই কলকাতার বাসিন্দা। বাংলা ভাষাটাকে এমনভাবে রপ্ত করেছিল অমর, যা যে কোনো বাঙালিকেও লজ্জা দিতে পারে। অমরদের বাড়ি থেকে তাদের বিয়েটা মেনে নেয়নি। তাই পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন না তাঁরা। গোলপার্কের কাছে একটা ভাড়া বাড়িতেই রেবতীর বৈবাহিক জীবনের মুখবন্ধটি রচিত হয়েছিল। পরে অবশ্য সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনেনও সেখানেই চলে যান। মধুরার জন্ম হল। অমর মাঝে মাঝে ছোট্ট মধুরাকে নিয়ে চলে যেতেন তাঁর পৈতৃক বাড়িতে। রেবতী তিন চারবারের বেশি যাননি। বড্ড রবাহুত মনে হত নিজেকে। তাছাড়া অমরও তেমন জোর করেনি কোনোদিন। মধুরাকে বছরখানেকের করে রেবতী আবার তাঁর কর্মস্থলে যোগ দিলেন। পুষ্পরাগ তখন ক্যালিফর্নিয়ায় চলে গেছে। একটু ফাঁকা ফাঁক লাগত রেবতীর। নিজেই যোগাযোগ করলেও পুষ্পরাগের সঙ্গে বুঝতে পারছিলেন শুধু তাঁরই একা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না।

—বৌদি? চিংড়িগুলো কি মালাইকারি করব?

—কেনরে। তোকে না সকালবেলা একটা নতুন রান্না শেখালাম চিংড়ি দিয়ে। এত ভুলে যাস কেন মালতী?

—অত খটমট নাম মনে থাকে না।

—তুই চিংড়িগুলোকে পাতিলেবুর রস আর অল্প একটু ওয়াইনে মাখিয়ে রাখ, আমি আসছি।

আবীরা ফোন করেছিল। আগামীকাল সে তার মার কাছে আসবে। আবীরার এই সেপ্টেম্বরে বাইশ পূর্ণ হয়েছে। পরিণত বয়স্ক বলতে আইনের ভাষায় যা বোঝায়, বয়েসের দিক থেকে আবীরা এখন দস্তুরমতো অ্যাডাল্ট। সুতরাং মেয়ে যখন ইচ্ছে আসতে পারে তার মায়ের কাছে। এই উইক এন্ডটা ভালোই কাটবে রেবতীর তাঁর এই আদুরে, ছটফটে এবং ভীষণ টকেটিভ মেয়েটার সঙ্গে। মধুরা এখানে আসলেও থাকেনি কখনও। সকাল সকাল এসে দুপুরের মধ্যেই চলে গেছে। মধুরার এখানে আসা মানে দরকারে আসা— ঠিক মায়ের কাছে আসা ওটাকে বলা যায় না। রেবতীর আজকাল মনে হয়, ইদিপাস কমপ্লেক্সটা না মানার কোনো রাস্তাই নেই। মধুরা তার প্রতিটি আচরণে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়— তার বাবাকে সে ছাড়া আর কেউ ভালোবাসতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। আর রেবতী তো নয়ই। আজ আরেকপেগ বেশি নিলেন রেবতী। একটা সিপ্ দিতে না দিতেই মালতীর ডাক পড়ল রান্নাঘর থেকে। চিংড়ির বিভিন্ন প্রিপারেশান খেতে ভালোবাসে আবীরা। অমরও খুব ভালোবাসত। আজকাল নাকি চিংড়িতে ওর অ্যালার্জি হয়। কত রঙ্গ দেখাবে লোকটা। অথচ কী প্যাশানেট ছিল তাঁদের প্রেমের সময়টা। অমরজিৎ ওর খানদানি ব্যাবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও ব্যবসায় গেল না। ডাক্তার হলো। প্র্যাক্টিস করল না, মেডিক্যাল কলেজে কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টের লেকচারার হলো। অমরের এই বাড়াবাড়িগুলো তখন কী অদ্ভুত রোমান্টিক লাগত রেবতীর। বিয়ের পর থেকেই টের পেতে লাগলেন রেবতী, তিনি চূড়ান্ত ইমপ্রাক্টিক্যাল একটা মানুষের সঙ্গে ঘর বসিয়েছেন। মধুরার জন্মের পর থেকে তিক্ততাটা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না। তাঁর কর্মজীবন গার্হস্থ্য জীবনকে অগোছালো করে তুলছিল ধীরে ধীরে। অশান্তি চরমে উঠল যখন রেবতীর সামনে বিদেশ যাবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ । ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার এই অমূল্য সুযোগটার জন্য কম কষ্ট করতে হয়নি তাঁকে। অসম্পূর্ণ গবেষণাটা যে আবার নতুন করে শুরু করতে পারবেন, সেটা ভেবেই সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল তাঁর।

অবশ্য আনন্দের আর একটা চোরা স্রোত নিজের ভেতরে টের পাচ্ছিলেন রেবতী। পুষ্পরাগ তখনও ক্যালিফোর্নিয়ায়। রেবতীর সেই স্বপ্নকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনতে পুষ্পরাগের ভূমিকাটাও খুব কম ছিল না। স্বপ্নকে সফল করতে গেলে যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, অমর তা বুঝত না এমন নয়, কিন্তু রেবতীর অধ্যবসায়কে কোনোদিনই বুঝতে চায়নি অমরজিৎ। উল্টে তাঁকে বাঁধা দিয়েছেন সেন্টিমেন্টাল যুক্তিতে— তিন বছরের মধুরাকে রেখে রেবতীর মা হিসেবে এটুকু স্যাক্রিফাইস নাকি করা উচিত। লাইক হেল, ও নিজে করত? রেবতীতো তবু মধুরাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথাও বলেছিলেন। এমনকি অমরজিৎকেও বলেছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় শেট্‌ল্ করার জন্য। কিন্তু অমর, চিরকাল সুযোগ হাতছাড়া করে নিজের নির্লোভ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাতেই মগ্ন থাকল। এতে রেবতীকে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যেতে বাধ্য করা যায়। আবার জ্ঞানগর্ভ কথা আছে।

—ছোটো বড়ো কথা আসছে কেন রেবতী? তার মানে তোমার মধ্যেই একটা গিল্টি কনসাইন্স কাজ করছে।

—এতে গিল্টি কনসাইন্সের কথা আসছে কীভাবে? স্বীকার করে নিলেই তো পারো অমর, বউয়ের অ্যাব্রোড যাওয়াটা সহ্য হচ্ছে না। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, এটা তোমার শোভিনিজ্‌ম্ -এ ধাক্কা দিচ্ছে তো?

—তুমি শিওর?

—কোন ব্যাপারটায়? একটু স্পেসিফিক্যালি বলবে?

—তুমি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছ? তোমার যা পোটেনশিয়াল তা সত্যিকারের কাছে লাগাতে পারছ কি? এদেশ বিদেশ সেক্ষেত্রে কোনো ম্যাটার করে না রেবতী।

—তোমার ডাক্তার ছাত্রদের আজকাল ফিলোসফির ক্লাসও নিচ্ছ না কি?

—সেটাই আফশোস। লাইফ ফিলোসফিটাই ইগনোর করছে সবাই। তা না করলে ওরা তোমার মতো এগিয়ে যেতে চাইত না।

—তাহলে এখানে থেকে কূপমন্ডুক হয়ে থাকাটাই তোমার প্রেসক্রিপশান।

—এই প্রেসক্রিপশানটা যে মানুষকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। কখনও পায়, কখনও পায়না।

—আমি পাব না, এটাই বলতে চাইছি তো?

—তুমি খুঁজবেই না।

—দরকারও হবে না। তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি অমর, সামনের মাসের চোদ্দতে আমার যাওয়ার টিকিট হয়ে গেছে। পুষ্পরাগই ব্যবস্থা করেছে।

—সেটা বোধহয় তোমার কাছেও স্পষ্ট নয় এখনও। যেদিন হবে, সেদিন তুমিই হয়ত শোনাবে।

—তুমি কি পুষ্পরাগের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু বলার চেষ্টাকরছ? এতে তো হেয়ালি করার কিছুনেই। তোমার কী ধারণা? পুষ্পরাগের ওপর তোমার কতটা হিংসে, সেটা আমি টের পাই না।

—নামখানা ভারি সুন্দর ছেলেটার— পুষ্পরাগ।

সেবার রেবতী ঘর ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়া পাড়ি দিয়েছিলেন। প্রায় ঘর ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েই। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ারকথা ভাবা আর সিদ্ধান্ত নেওয়া দুটোর মধ্যেই যে প্রচণ্ড ব্যবধান সেটা দিনের পর দিন আরও গভীর ভাবে বুঝতে পারছিলেন রেবতী। তাঁর দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ মন একমাত্র শান্তি পেত পুষ্পরাগের কাছে। ওখানে গিয়ে দিনের পর দিন অবসাদে ভুগছেন তিনি। পুষ্পরাগ তাঁকে বোঝাতেন,

—প্রথম প্রথম এরকম ডিপ্রেশান কম বেশি সবারই হয়

—কেন?

—হোমসিকনেস বলে একটা ব্যাপার আছে তো! তাছাড়া এই শীতকালটা এমনিতেই ডিপ্রেসিভ। দেখবে, শীতপ্রধান অঞ্চলে, পাহাড়ি এলাকায় মানুষজন খুব কালারফুল জামাকাপড় পড়ে। হয়ত ঠিকমতো দু'বেলা খেতে পায় না, কিন্তু রঙিন হয়ে থাকে। রঙ দিয়ে নিজেদের বুসট আপ করে।

—এটা কি তোমার থিওরি?

—না, অবজারভেশান।

রেবতীকে এখানকার জীবনযত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত করিয়ে দিয়েছিল পুষ্পরাগ। রেবতীও ধীরে ধীরে তাঁর ধার্য কর্মজগতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনযাত্রা। বাড়িতে তারই মধ্যে ফোন করতেন। মধুরার মুখটা মনে পড়ত বারবার। কিন্তু অমরের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর তাঁকে যেন ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দিতে লাগল। আর ক্রমশ নৈকট্য বাড়তে লাগল পুষ্পরাগের সঙ্গে। মাঝে পুষ্পরাগ এক বছরের জন্য দেশে এসেছিল। রেবতী তখন তাঁর পেয়িং গেস্টের তক্‌মা ছেড়ে পুষ্পরাগের ছোট্ট অ্যাপার্ট মেন্টটাতে থাকছিলেন। পুষ্পরাগ ফিরে এলেও তাঁর পুরোনো জায়গায় ফেরা হল না। তখন থেকে তাঁরা প্রায় স্বামী - স্ত্রীর মতোই জীবনযাপন করতেন। বৈবাহিক সম্পর্কের জটিলতা থেকে মুক্তি পেতেই হয়ত পুষ্পরাগের বুকে প্রাণ ভরে স্বাধীন নিঃশ্বাস নিতেন রেবতী। বাড়িতে ফোন করা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। মধুরার জন্য মনটা টানলেও নিজেকে জোর করে আটকে রাখতেন। তাছাড়া যখন হবেই তখন আর পিছুটান রেখে লাভ নেই। রেবতীর দেশে ফেরার সময় ও দরকার দুটোই ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। তখনই আবিষ্কৃত হলো পিছুটান অন্যভাবেও আসতে পারে। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁর শরীরে পুষ্পরাগের চিহ্ন গঠন করল আবীরার ভ্রূণ। আইনত রেবতী তখনও অমরজিৎ কউড়ের স্ত্রী। ধারণ করেছেন পুষ্পরাগের সন্তান। প্রথমে ভেবেছিলেন অ্যাবর্শান করিয়ে নেবেন। তাতে বাধাও কিছু ছিল না। কিন্তু একটা নিষ্পাপ প্রাণকে শরীরে ধারন করে নিশ্চুপে তাকে হত্যা করার মতো মনের জোর তাঁর ছিল না। চিন্তাভাবনা করার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর তখন ছিল না। তিনি অমরজিৎকেই ফোন করলেন। বললেন সব কথা। নিষ্ঠুরতা বোধহয় মানুষকে সব অবস্থাতেই শান্ত রাখতে পারে। খুব শান্ত গলায় বলেছিলেন অমর।

—কী করতে চাও?

—আমি ডাইভোর্স চাই অমর।

—দ্যাখো, কাগাজেকলমে না হলেও আমরা আর বোধহয় স্বামী স্ত্রী নই। সেক্ষেত্রে ডাইভোর্স পাওয়াটা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

—পুষ্পরাগ জানে?

—এখনও না। জানাব।

—দেখ। কী বলে?

পুষ্পরাগ স্থির চোখে চেয়েছিল ওঁর দিকে। অনেকক্ষণ পর যে কথাটা বলল, তাতে রেবতীর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল।

—দেখো রেবতী অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক থাকা মানেই কিন্তু বিয়ে ভেঙে ফেলা নয়।

—মানে? এটা একটা শুধু শারীরিক সম্পর্ক?

—পুরোটা নয়, তবে অনেকটাই।

—কী বলছ তুমি। একটা প্রাণ আমার শরীরে জন্ম নিয়েছে এবং সেখানে তোমার দায় নেই?

—অস্বীকার তো করছি না। অ্যাক্সিডেন্টালি দায়টা আমার থাকছেই।

—অমর ঠিকই বলছিল। তোমার এই উত্তরটার আমার দরকার ছিল।

—আমার দায়ের খবর আগে অমরজিৎই যখন জানলেন, তখন বাকি সাজেশানটাও উনিই ভালো দিতে পারবেন বোধহয়।

—মানে তুমি অস্বীকার করছ, তাই তো? আমি জানতাম। তোমাকে আগে জানালে তুমি অ্যাবর্ট করতে বলতে।

—জানিয়েছ কি?

—উত্তরটা যখন জানা, তখন জানাবার আর প্রয়োজন কি।

—আমার কিন্তু তোমাকে বিয়েতে কোনো অসুবিধে ছিল না রেবতী। কিন্তু অনেস্টলি ইস্যুর ব্যাপারে আমি কখনও ভাবিনি। অন্তত : এরকম একটা সিচুয়েশানে।

রেবতী দেশে ফিরলেন। বোলপুরের বাড়িতেই উঠলেন। মধুরার জন্মের বছরই বাবা মারা গেছেন। মা-কে তিনি জ্ঞানত মনে করতে পারেন না। একাই যুদ্ধটা করবেন স্থির করেছিলেন রেবতী। অমরকে জানিয়েও ছিলেন সে কথা। অমর তার স্বভাবোচিত শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল,

—এটা ছেলে খেলা নয় রেবতী। আইনত এখনও তুমি আমার স্ত্রী। পুষ্পরাগের সন্তানকে ধারন করেছ। একটা নিষ্পাপ প্রাণকে এতটা অনিশ্চিত পরিচয়ে জন্ম দেওয়া তো বিশ্বাসঘাতকতা।

—তোমার মহত্ব দিয়ে আর কত নাটক করবে অমর?

—মহত্ব নয়, মনুষ্যত্ব। ও আমার পরিচয়েই জন্মাবে এবং বড়ো হবে।

—কোন অধিকারে তুমি একথা বলতে পারছ?

—একজন ডাক্তার ও মানুষ হিসেবে সেই অধিকার আমার আছে রেবতী।

—আমি জোর করলে তুমি আইনের দোহাই দিয়েও ওকে তোমার কাছে রাখতে পারবে না।

—সেই জোর তোমার আছে কি? জোর দিয়ে চাইতে পারছ কোথায়?

সত্যিই সেদিন তিনি জোর করতে পারেন নি। ফিরে এসেছিলেন সল্টলেকের বাড়িতে। মধুরা তখন বছর সাতেকের। জগৎসংসার পৃথিবী—সব তার বাবা। মাকে চেনে না। তবু বোধহয় মাতৃত্ব বোধই ওই কটা দিনের জন্য রেবতীকে সত্যিকারের মা করে তুলেছিল। অমরের ব্যবহার শীতল থেকে শীতলতম হয়েছে, পুষ্পরাগের ওপর রাগ ক্ষোভ অভিমানের ঝড় উঠেছে, তবু বছর দেড়েক সময়ই যেন রেবতী সত্যিকারের মা হতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ রেবতী চম্‌কে উঠলেন। তাঁর আগেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কাল তো পুষ্পরাগও আসছে। আবীরা যে এখনও জানে না তার জন্ম বৃত্তান্ত।

।। ছয়।।

শাক্য দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল কৃষ্ণেন্দুকে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাবু আসছেন। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। পিঠে বোধহয় একটা ঝোলাও আছে— তার ফোটোগ্রাফার ভাইয়ের পূর্ণচিত্র। এ মুহূর্তে কৃষ্ণেন্দুকেই একটা সাবজেক্ট্ মনে হচ্ছিল শাক্যর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শাক্য।

—এলি তবে?

—হ্যাঁ। বাড়িতে ঝাঁটার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা এখনও কানে বাজছে মাইরি।

—কানের গোড়ায় খাসনি তো?

—ওটাই বাকি ছিল আর। এখানে ঠান্ডাটা বড্ড বেয়াড়া।

—ব্যবস্থা আছে। বাড়িতে তো ঢোক।

—ওহ্। থ্যাংক্স ব্রাদার।

এখানে একটা বাড়ির দোতলায় দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে শাক্য থাকে। বাড়িওয়ালা অম্লান দত্ত সপরিবারের থাকেন কলকাতায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এখানে শাক্যর একছত্র আধিপত্য। বাড়িটার সামনে বেশ কিছুটা

জায়গা আছে। অম্লানবাবুর অনুমতি নিয়ে শাক্য সেখানে বাগান করেছে। অংক ছাড়া শাক্যর দুটো নেশা - বাগান করা আর শব্দ রেকর্ড করা। দ্বিতীয় নেশাটা অনেকটা কৃষ্ণেন্দুর না বলে ছবি তোলার মতো। শাক্য প্রায় সবসময়ই ওর কাছে একটা ছোটো রেকর্ডার রাখে। তাতে পাখির ডাক থেকে তার স্কুলের বেসুরো প্রার্থনা সংগীত, রাস্তাঘাটে সাইকেল রিক্সার শব্দ, পথচলতি মানুষের কথা, ঝগড়া— সব কিছুই সে অবলীলায় রেকর্ড করে। এভাবে অগুনতি শব্দের ক্যাসেট জমা করে রেখেছে সে তার দুটো শোকেসে। শোকেসের পাল্লা সুন্দর পর্দা ঢাকা, যাতে কাসেটগুলো চোখে না পড়ে। অবশ্য এখানে শাক্যর তেমন পরিচিত লোকও নেই, যাকে তার এই ব্যক্তিগত ঘরটাতে এনে বসাতে হবে। যারা আসে তারা বাইরের বসবার ঘরটা থেকেই বিদায় নেয়। মাঝে কৃষ্ণেন্দু আসে। আর বছরে দু-তিনবার সে বাবাকে নিয়ে আসে এখানে। তার বাসস্থানটা একটু শহর ঘেঁষা, কিন্তু স্কুলটা প্রত্যন্ত গ্রাম বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সুবাদে শাক্যর সাইকেল চালানটা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। শাক্যর কেন যেন মনে হয় বাবা তার এই জীবনযাত্রাটা সমর্থন করেন। হয়ত, এই ছোটো সন্তানটির প্রতি একটু বেশিই দুর্বলতা আছে কুন্তল সেনের। না হলে অনেকেই তাকে এখানে চাকরি করার ব্যাপারে নানা উপদেশ দিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি নাক সিঁটকিয়েছিল দিদি,

—শুধু শুধু এঁদো গ্রামে পড়ে থেকে নিজেকে ম্যরালিস্ট দ্যাখাতে চাস। যতসব ন্যাকামি।

মৈনাকদা উদারতার মুখোশে বলেছিল।

—সখ যখন হয়েছে, করুক কিছুদিন সমাজসেবা। সবাইকে তো আর আমেরিকা, ইংল্যান্ড কোলে তুলে নেবে না। শাক্যর এই সখটা বরং ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

ঋষভও বিরক্ত হয়ে বলেছিল,

—যা পারিস কর। তবে কলেজে পড়ালেও তোর ম্যরাল ভ্যালুস উড়ে যেত না। ফেমাস লইয়ার কুন্তল সেনের ছেলে স্কুলমাস্টার। চমৎকার।

শাক্য মুচ্‌চি মুচ্‌কি হেসেছে। কারো কথায় কোনো উত্তর দেয়নি। কারণ উত্তরগুলো শোনার সহ্যশক্তি ওদের নেই। দেখতে দেখতে বছর তিনেক হয়ে গেল এই স্কুলে। একটা বিষয়ই শাক্যকে অশান্ত করে তোলে, স্কুলের পরিবেশ। স্কুল না টাকা চুরির দপ্তর, বোঝা দায়। ছাত্রদের অবস্থাও তথৈবচ। মাঝে মাঝে শাক্যর মনে হয় ক্লাসরুমে কতগুলো বেত ছাড়া আর কিছু বুঝি নেই। তবু হাল ছাড়ে না সে। এদের মধ্যে থেকেই একদিন না একদিন দু-চারজনকে সে ঠিক পাবে, যারা এদেশে থেকেই, এদেশের হাজার অসুবিধের মধ্যেও সুবিধেটুকুকে খুঁজে নিয়ে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ করে দেখাবে। ক্রমে ক্লাসে দু-চারজনের সংখ্যা বাড়বে। এদেশের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যে সীমাবদ্ধতার ধারনা আছে, সেই ধারনাটাকে বদলে দেবে ওরা। শাক্য নিজেও জানে এটা তার কল্পনা বিলাস, ছেলেমানুষী— কিন্তু এটুকু ছেলেমানুষী ছাড়া যে তার চলবে না।

কৃষ্ণেন্দু শাক্যর ক্যাসেটগুলো নাড়া চাড়া করে দেখছিল। প্রত্যেকটা ক্যাসেটের ওপরের খাপে শাক্য একটা নাম দিয়ে রাখে। অদ্ভুত আজগুবি সব নাম। বেশির ভাগই আবোল তাবোল থেকে ধার করা। কোনোটা হাট্টিমা টিম্ টিম, কোনটা রামগড়ুরের ছানা, কয়েকটা আবার শাক্যর স্বরচিত। ঝিঙ্গাবাদ, ধ-এ ধাক্কা, লবডঙ্কা, হামাগুড়ি, ছানাপোনা ইত্যাদি অগুনতি নাম ও তার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করে কৃষ্ণেন্দু। এসময় কৃষ্ণেন্দুর মুখটা দেখলে খুব হাসি পায় শাক্যর। এবারেও কানে এয়ারফোন গুঁজে বিচিত্র নামধারী ক্যাসেটের রহস্য খোঁজার চেষ্টা করছিল কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু সে ভীষণরকম ব্যর্থ হচ্ছে সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ক্যাসেট হাতে নিয়ে নামটা পড়েই কৃষ্ণেন্দু বলে উঠল,

—এটা কী রে শাক্য? এ তো গানের লাইন।

—হ্যা, একটা রবীন্দ্রসংগীতের লাইন। তবে ওটায় যা আছে পুরোটাই জলে।

—কেন?

— এখন বোধহয় আর শোনা যায়না।

কৃষ্ণেন্দু কী ভেবে যেন ক্যাসেটটাশুনল না। মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অন্য ক্যাসেটগুলো ঘাঁটতে লাগল। দেশী মদের গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। শাক্য ও রসের বশীভূত হতে পারেনি, তার বমি পায়। কৃষ্ণেন্দু আসলে এই একটাই অসুবিধে বোধ করে সে। শাক্য কৃষ্ণেন্দুর নতুন তোলা ছবির প্যাকেটটা নিয়ে বসবার ঘরে চৌকিটায় বসল। কৃষ্ণেন্দুর প্রেমিকাসুলভ ক্যামেরাটা পরপুরুষ বলতে একমাত্র শাক্যরই স্পর্শ পায়। কথাটা মজা করে কৃষ্ণেন্দুই বলেছিল একবার। শাক্য হেসে বলেছিল,

—পরকিয়া বড় মধুর রে।

একটা সিগারেট ধরাতে খুব ইচ্ছে করছিল শাক্যর। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর চিত্রসুন্দরীদের ভয়ে এত সাবধানে খেতে হবে যে সিগারেট খাবার আমেজটাই মাটি হয়ে যাবে। শাক্য মন দিয়ে ছবিগুলো দেখছিল। হরেক রকম ছবি, প্রত্যেকটাই প্রায় ইউনিক। একটা মেয়ের পাঁচ, পাঁচটা ছবি, অথচ প্রত্যেকটাতেই অন্যরকম লাগছে মেয়েটাকে। মেয়েটা ছুটকি, মধুরাদির বোন আবীরা। বিয়েবাড়ির দু-তিনটে গ্রুপ ছবিও আছে। পাখিদির বিয়ের ছবি। মধুরাদির কাছে মাঝে মাঝেই আসত পাখিদি। কীসব যেন সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম ছিল মেয়েটার। একটা ছবিতে চোখ পড়তেই শাক্যর ভুরুটা

কুঁচকে গেল। কনের সাজে পখিদি ও তার পাশেই বসে আছে মেয়েটা। মেয়েটা তার চেনা অথচ এখানে ঠিক যেন ততটা চেনা লাগছে না। মেয়েটা হাসছে, আর পাঁচটা মেয়ের মতোই সাজগোজ করেছে - তবু কী একটা যেন মিসিং।
—কার ছবি এত মশগুল হয়ে ঝারি দিচ্ছিসরে শাক্য?
—তোর অগুনতি গার্লফ্রেন্ডদের।
না বস্। ওসব বলে লাভ নেই। তুমি এই বিশেষ ছবিটা হাতে মিনিট পাঁচেক হলো তন্ময় হয়ে আছ। আমি তোমার সামনে চেয়ারে এসে বসেছি তা-ও টের পাওনি।
—এই ছবিটা নিখুঁত হয়নি। সেই খুঁতটাই মন দিয়ে আবিষ্কার করছিলাম।
—খুঁত?
—কেন? থাকতে পারে না?
—চান্স কম। খুবই কম।
—তবে এটা সেই 'খুবই কম' এর মধ্যেই পড়ে।

।। সাত।।

মধুরার ইনবক্স ভরে আছে চিঠিতে। বেশিরভাগই ফর্মাল এবং বোরিং। 'কেমন আছ' বা 'কেমন আছিস' দিয়ে চিঠি শুরু, যেটা তার সবচেয়ে বিরক্তির মনে হয়। লোকে যে কেন লেখে কথাটা? দূর থেকে সে কেমন আছে। সেটা জেনেই বা তারা কী করবে? কথাটার আন্তরিকতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। যেন একটা কথার কথা। আজকে অবশ্য এমন দুজন মেইল করেছে যাদের লেখা পড়তে তার সত্যিই খুব ভালো লাগে। এখনও কেমন একটা আদুরে গন্ধ মাখান থাকে চিত্রা আর পালকের চিঠিগুলোতে চিত্রার ভাষাটা অসাধারণ। এত সুন্দর গুছিয়ে যে নিজেও লিখতে পারে না। পালকেরটা হয়ত সে তুলনায় একটু অগোছালো, কিন্তু কেমন যেন কবিতা কবিতা একটা ব্যাপার আছে। ওদের চিঠি দুটোর উত্তরই দিচ্ছিল মধুরা। বাকিগুলো দায়সারা গোছের রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছে। এমনকি কনিষ্কেরটারও। কণিষ্ক ওদেরই ব্যাচমেট ছিল। টুয়েলভের পর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শিবপুর চলে গেল। কিন্তু যোগাযোগটা থেকেই গেছিল, আবীরাদের সাইন্সটা শনি রবিবার করে পড়াতে আসত কণিষ্ক। কণিষ্ককে খারাপ লাগত না মধুরার। ইলেভেন থেকেই ওর ব্যথা ছিল পাখি — বেচারা তখন মুখফুটে বলার সাহস করেনি। আর করবেই বা কী করে? পাখির যা মূর্তি ছিল। আজ গলায় গলায় বন্ধু তো কালই সে চক্ষুশূল। অথচ, এই ব্যবহারের পেছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকত না। মধুরার সঙ্গেই তো কতবার ঝামেলা লেগে গেছে। কিন্তু তারপরই পাখি এমন কান্না কাটি শুরু করত যেন মধুরার মতো বন্ধু না থাকলে সে মরেই যাবে। তারা পাখির এই বিচিত্র ব্যবহারকে পরের দিকে আর সিরিয়াসলি নিত না কিন্তু গ্রাজুয়েশানের শেষের দিক থেকে পাখি যা শুরু করল, সেটাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। পাখি তখন অবন্তীর প্রেমে মশগুল। মধুরা কে সে প্রায় চেনেই না। মধুরা বুঝেছিল ব্যাপারটার মধ্যে কোনো শক্ত ভিত্তি নেই, অন্তত যাতে একটা সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে। কণিষ্ক তখন আবীরাদের পড়ায়। মধুরাই ব্যাপারটা কনিষ্ককে বলেছিল, বাবার সঙ্গে আলোচনা করে ওরাই পাখির মাকে সব জানায়। অবশ্য ততদিনে পাখির কর্মকান্ড আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। ওকে সাইকায়াটিস্ট দেখান হচ্ছিল। পালকরা তখন টয়েলভে পড়ে বোধহয়, সেসময় পাখিকে ধাতস্থ করা গেছিল কিছুটা। পালকের তখন কতই বা বয়েস। অথচ কী পরিণত ছিল মেয়েটার মন। এখন একটা অদ্ভূত অপরাধবোধ কাজ করে মধুরার মধ্যে। তখন পালককে অতটা ছোটো মেয়ে বলে ভাবাটা উচিত হয়নি। অন্তত পরবর্তী ঘটনাগুলো তা-ই বলে। কণিষ্ক ভালো চাকরি পেল। পাখিকে বেশ পাকাপোক্ত ভাবে নিজের সঙ্গে বাঁধল। মধুরা ব্যাপারটাকে মনে মনে তখন অ্যাপ্রিশিয়েট করত— সেই ছোটোবেলাকার প্রেম যা নিয়ে লোকে একটা সময়ে হাসাহাসি করে, কণিষ্ক কিন্তু সেই বয়েসে এসেও ভীষণ কমিটেড ঠিল, পাখির প্রতি। মধুরার প্রথম খটকা লেগেছিল পালককে নিয়ে। যে পালক তার দিদির কর্মকান্ড আর কাউকে না হোক মধুরাদিকেই শুধু বলত, সেই পালকই কেমন যেন চুপ করে গেল। ভীষণ রকম চুপ। শুধু একদিনই পালক বলেছিল,
—বাবার জন্য যে এই নাটকটা দরকার ছিল মধুরাদি। দিদিকে সুস্থ একটা জীবন না দিতে পারলে বাবা আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। তুমি প্লিজ এই বিষয়টা নিয়ে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না।

কণিষ্কের মহান কমিটমেন্টের দাম যে পালককে দিতে হবে সেটা ভাবতেই পাবেনি মধুরা। পালককে এ বিষয়ে সে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞাস করেনি। শুধু সেদিনের ওই কথাটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল কণিষ্ক পালককে ব্যবহার করেছে পাখিকে খাঁচায় ধরার জন্য। আর পালকটাও এত প্রিটেন্‌টিভ যে কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। মধুরা যখন বুঝেছে তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। আরও একটু আগে বুঝতে পারলেও কিছু একটা করা যেত বোধহয়। চিত্রাটা ও একটা হিন্ট দিলে না। আর আবীরাটা তো চিরকালের ফাজিল। আজও কোনো ব্যাপারকেই সিরিয়াসলি নেয় না। সেই আবীরাও কিছু বলেনি। অথবা এমনভাবে বলেছে যা মধুরা গুরুত্ব দেয়নি। অনেক ভেবে দেখেছে সে পালকের

জীবনের এই ছন্দপতনটার জন্য সেও দায়ি। মধুরার অবাক লাগে মেয়েটার সহ্যসীমা দেখে। কণিষ্ক ওরই দিদিকে বিয়ে করল, বিয়ের আগে প্রেম করল আর তারও আগে এই প্রেম প্রায় বিবাহের ক্ষেত্রটা সাজাল পালকের সঙ্গে একটা খেলা খেলে। কীভাবে সহ্য করে পালক? কমিটমেন্ট? প্যাশান? না কি এই চেনাজানা শব্দগুলোর বাইরেও কিছু একটা আছে। আছে তো নিশ্চয়ই, নাহলে আজও সে নিজের বিয়ের কথা ভাবতে পারে না কেন? মৈনাক তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বলে কি সে এতদিন ধরে বিরহে কাতরাচ্ছে? না। তবে অপমানটা এখনও সহ্য করতে পারছে না? না, তাও না। সে কি প্রতিশোধ চায়? একেবারেই না। আসলে বোধহয় এরকম ঘটনায় কিছু মানুষের সম্পর্কের ওপর আর তেমন বিশ্বাসই থাকে না। আর তার তো বড়ো হয়ে ওঠাটাই ভাঙনের মধ্যে দিয়ে। সেদিক থেকে আবীরা লাকি। ও ভাঙনের একধারে, মাঝখানে নয়। যদিও তার ভীষণ আদরের ছোটো বোনটা এখনও একটা ভয়ঙ্কর সত্য জানে না। সেও জেনেছিল বেশ বড়ো হয়ে, বাবাই বলেছিলেন। আবীরা যদি জানতে পারে, সেদিন আবীরাও তার কাছে অচেনা হয়ে যাবে। যেভাবে মা অচেনা হয়ে গেছে, মৈনাক অচেনা হয়ে গেছে। তার জীবনে একমাত্র চেনা মানুষ, তার বাবা। এতগুলো ভাঙন শরীরে মনে একাকার করেও সম্পূর্ণ একটা মানুষ।

—দিদি, ড্রয়িং রুমে তোর জন্য একজন ওয়েট করছে?

—কে?

—তোর বন্ধু।

—আমার বন্ধু, কিন্তু আমার তো..

আবিরা অধৈর্য হয়ে বলল,

—প্লিজ তাড়াতাড়ি যা আমি ফোনে ব্যস্ত আছি। আর এক্সপ্লেনই করতে পারবনা।

মধুরা বেশ অবাক হচ্ছিল। কে আবার বন্ধু? তার তো এখন তেমন কোনো বন্ধু নেই, যে বাড়িতে এসে আড্ডা দেবে। আর কলেজের কলিগরা কলেজেই সীমাবদ্ধ তাছাড়া মধুরা কোনোকালেই তেমন আড্ডাবাজ নয় বরং শ্রোতা হিসেবে ভালো। নাইটির ওপর হাউসকোটটা চাপিয়ে ড্রয়িং রুমে এলেন মধুরা। সোফায় সে বসে আছে তাকে দেখে কিছুক্ষণ পা নড়ছিল না ওর। জাহ্নবী তার বাড়িতে। এও সম্ভব। এও সম্ভব। বেশ গ্ল্যামারাস লাগছে জাহ্নবীকে। একটা পাটিয়ালা কুর্তা পরেছে, সুগন্ধিতে চার পাশ আমোদিত। আড়ষ্টতা কাটাতে নিজের সবচেয়ে অপছন্দের প্রশ্নটাই করে ফেলল মধুরা,

—কেমন আছিস?

—খুব ভালো। তুই কেমন আছিস? মাঝে দুবার দেশে এলেও তোর সঙ্গে দেখা করার সময় পায়নিরে। জানিসই তো বাবা আজকাল একদম ছাড়তে চায় না। তাছাড়া মৈকের বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও তো দেখা করতে হয়, একদম সময় হয়নারে।

চমকে উঠল মধুরা। মৈনাককে দেওয়া তার নামটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে জাহ্নবী। সেদিন জোর করেই ওকে পাশের ক্লাসটা করতে দেয়নি মৈনাক। প্রেসিডেন্সির এক নিভৃত কোনো মধুরা বলেছিল।

—মৈনাক, তোর নামে নাকটা না গলালেই ভালো হত।

—সেকিরে। না কাটতে বলছিস নাকি?

—আমি তোকে মৈক বলব।

—ছ্যা:। কেমন 'মই' 'মই' শোনাচ্ছে।

শোনাক। তবু ওই নামেই সাড়া দিতে হবে তোকে। দিবি না?

অপলক মুগ্ধতায় চেয়ে থেকে মৈনাকের ঠোঁট চেপে ধরেছিল মধুরার ঠোঁটকে। ঘন মেঘের মতো আর্দ্র ছিল সেই আলিঙ্গন। মধুরা ভিজে যাচ্ছিল ভিজিয়ে দিচ্ছিল মৈনাককে। কী সহজে সেই মৈনাক তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নির্জন মরুভূমিতে। কী অবহেলায় সেই সব ছবি কথা। অঙ্গীকার ভুলে গেল মৈনাক। 'মৈক' ডাকবার অধিকার দিয়ে দিল জাহ্নবীকে। মধুরা জানে জাহ্নবী মৈনাকের ছেলের নাম কিংশুক। ফুলের রঙ সে সময় পাগল করে দিত মধুরাকে—যে গাছটা নিজের সবটুকু দিয়ে আগুন ফুলে ফুটিয়েছে। নিজেকে যে এত সার্থকভাবে রিক্ত করা যায়, সেটা ভাবতেই একটা অচেনা অনুভূতি রয়ে যেত তার শরীরে, মনে। মৈনাকের বুকে মাথা রেখে বলেছিল মধুরা,

—ওই গাছটা দ্যাখ মৈক। আমিও ওর মতো রিক্ত হয়ে আগুনফুল ফোটাব। আমার মুখে থাকবে রিক্ততার আভিজাত্য, কোলে আগুনফুল—আমাদের ছেলের নামা রাখব কিংশুক মৈনাক অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিল,

—তোকে না মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগে মধুরা। একটা সাধারণ পলাশগাছ দেখে এমন করিস, যে আমার সত্যিই ভয় লাগে তুইও শেষ পর্যন্ত একদিন গাছ হয়ে যাবি নাতো?

মধুরা নিজে থেকে কিছুই হয়নি। বরং মৈনাকই তাকে মৃত্তিকার গভীর সেচন ভূমিতে কবর দিয়েছিল। সে জানে না, আদৌ সে উপ্ত হয়ে সত্যিই একদিন গাছ হয়ে উঠবে কিনা?

জাহ্নবীর কথায় তার নির্জন কবর প্রদেশ কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

—তোর একটুও চেঞ্জ আসেনি মধুরা।
—মানে?
—এখনও চুপ করে থাকিস আর আমার মতো টকেটিভ লোকেদের কাছে কথা শুনে যাস।
—বাজে কথা কেউ বলে না।
—এই তো, আমিই তখন থেকে বকেই চলেছি। আর তুই চুপ করে বসে শুনে যাচ্ছিস।
—আমি যে তোর মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারি না জাহ্নবী।
—খুব পারিস। আমি যেন শুনিনি।

মধুরা ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বার করে প্লেটে সাজিয়ে জাহ্নবীর সামনে রাখল। জাহ্নবী আগে খুব কোল্ড ড্রিংক্স খেত। এখন বোধহয় খায় না। ওদেশে তো আবার ফ্রুট জুসেরই বিভিন্ন রকমফের ঘটে। মিষ্টি দেখে জাহ্নবী প্রায় আঁতকে উঠল,

—ওরে বাবা। এত মিষ্টি খেলে লাঞ্চটা স্কিপ করতে হবেরে।
—মোটা হয়ে যাবি ভাবছিস?
—ভাবব কি? হয়ে গেছি। রেগুলার জিমে যাই। এখানে আসলেই সব দফারফা। বাবাকে তো জানিস, খাওয়াতে পারলে আর কিছু চায় না। ছেলে তো এত স্পাইসি খাবার খেতেই পারে না।
—ওকে আনলি না কেন?
—সে? কার্টুন ছেড়ে নড়বেই না। দাদু- নাতি বসে কার্টুন দেখছে।

মধুরা নির্বিকার মুখে জাহ্নবীর রঙ মাখান বাহারী কথাগুলো শুনছিল। মন্দলাগে না তার, মায়ের কাছে মাসির গল্প শুনতে। এটাও একটা আর্ট। এবং এই আর্টটা জাহ্নবীর জন্মগত প্রতিভা। মৈনাকের ফিনিশিং টাচে এখন এথনিক বিউটি পেয়েছে। সেন জ্যেঠুর সঙ্গে তাঁর বড়ো কন্যাটির সম্পর্ক যে কেমন, সেটা মধুরার থেকে সুস্থভাবে খুব কম লোকই জানে। শাক্য ছাড়া সেন জ্যেঠু তাঁর বড়ো পুত্র কন্যাকে একবার প্রায় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মধুরা সেদিন একটা কথা বলেছিল,

—এই সিদ্ধান্তগুলো মানুষকে কি কোথাও লিড করায় জ্যেঠু? ওদের ত্যাগ করে তোমার উত্তরণ কোথায়?
—তুই কি বসছিস মধুরা। বাড়িটাও ওদের নামে লিখে দেব?
—তোমার ইচ্ছে হলে দাও। তাতেই বা উত্তরণ কোথায়?
—উত্তরণ তোর মতো বোকাদের ত্যাগে।
—বোকারা ত্যাগ করে না, গ্রহণ করে। তুমিও না হয় বোকাই হলে একটু, ক্ষতি কী?
—আমার মুস্কিল কী জানিস? তোর কথাগুলো বড্ড ধাক্কা দেয় বুকে। আইন মানে না। যা, আজও তুই-ই জিতলি।
—বলো, বোকারা জিতলাম।

সেন জ্যেঠুর বরাবরই তার প্রতি একটা আলাদা স্নেহ আছে, জাহ্নবী সেটা কোনো কালেই সহ্য করতে পারেনি। আরও অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেনি। তাই অকারণে আজ তাকে ফানুসের মতো গল্পটা শুনিয়ে গেল। হয়ত জ্বালাটা এখন ও রয়ে গেছে ওর মধ্যে। অথচ সত্যি কথা বলতে কি একমাত্র শাক্য ছাড়া মিস্টার কুন্তলসেনের নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করার ক্ষমতা ঋষভ বা জাহ্নবী, কারোরই নেই। বাবা মাঝে মাঝে মজা করে বলে,

—কেন? মাই ডালিং লেডি তো আছে আমাদের মতো মানুষগুলোর জন্য।

জাহ্নবী চলে গেছে অনেক্ষণ। তবু সোফাতেই বসে রইল মধুরা। কেন যেন বার বার প্রেসিডেন্সিতে পড়ার দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। ল্যাবে মৈনাক প্রায়ই ইচ্ছে করে হাতে অ্যাসিড ফেলত। যতনা জ্বলত, আহা - উহু করত তার তিনগুণ। উদ্দেশ্য একটাই — মধুরা কখন ভীষণ বকবে! গম্ভীর হয়ে হাতে মলম লাগাবে। এবং শেষে আর থাকতে না পেরে বলে উঠবে,

—দ্যাখ মৈক, এটাই শেষবার, তুই ভালো করেই জানিস এই ন্যাকামীগুলো আমি সহ্য করতে পারি না। তাই পরের দিন বাড়িলোশানের মতো অ্যাসিড মাখলেও কোনো লাভ হবে না।
—পুড়ে ছাই হয়ে যাব যে রে।

মৈনাক পোড়েনি। জাহ্নবীর পুণ্যবারিতে মধুরাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। কলিং বেলের শব্দে বিরক্ত হলো মধুরা। তার যে এখনও ওই ফেলে আসা সময়টাতেই থাকতে ইচ্ছে করছে। সব মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু ওই মুহূর্তগুলোর মধ্যে এতটুকুও কী সত্যির নির্যাস ছিল না? দরজাটা কেউ খুলছে না। কলিং বেলটা আবার বাজছে। কোথায় যে যায় সব। অলস পায়ে অন্যমনস্ক হয়েই দরজাটা খুলল সে।

—স্যার বাড়িতে আসতে বলেছিলেন। আমি কি একটু অপেক্ষা করতে পারি?

উত্তর দিতে একটু দেরিই হল মধুরার। গলার স্বরটা অদ্ভুত তো ছেলেটার। ছেলে নয়, লোকটার। এর আগেও বহুবার এসেছে বাবার কাছে। বাবার এই প্রিয় ছাত্রটি একেবারে অপরিচিত নয় মধুরার কাছে। তবে আড ডঃ সম্বিত

রায়ের গলাটা তাকে চমকে দিল কেন?

।। আট।।

—তুমি 'আরোগ্য নিকেতন' পড়েছ?
—পড়েছিলাম। ছোটোবেলায়।
—সিনেমাটা দেখেছ?
—সেটাও ছোটোবেলায়। হঠাৎ 'আরোগ্য নিকেতন' নিয়ে শুরু করলি কেন বলত?
—আচ্ছা, তুমি যদি মশাইয়ের নাতিটা হতে, কী করতে?
—খামোখা সেটা হতেই বা যাব কেন?
—ধরো হলে। কী করতে?
—কি মুস্কিল। এমন বিদ্‌ঘুটে একটা ব্যাপার ধরবই বা কেন?
—বলোই না সম্বিতদা, হলে কী করতে?
—সে যা করেছিল আমিও তাই-ই করতাম। কারণ তারাশঙ্কর আমাকে দিয়ে সেটাই করাতেন।
—ধূর তোমাদের না একটুও ইমাজিনেশান নেই।
—সবার কি সবটা থাকেরে পালক। তবে ইমাজিনেশান আমাদের সবার মধ্যেই অল্প বিস্তর থাকে। এক্ষেত্রে আমারটা অল্প আর তোরটা বিস্তর। গল্পের বই পড়া আর সিনেমাদেখা ছাড়া তোর আপাতত কোনো বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই, তাই তো?
—আপাতত মানে? আমি চিরকালই পড়ি এবং দেখি। আর অবাক হই।
—সেটাও আমরা সবাই কম বেশি হই।
তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলাই উচিত নয়।
—কেন বলত?
—তুমি ওঁদের ইমাজিনেশানের স্প্যানটাই ধরতে পারছ না। যাঁরা লেখেন বা সিনেমা তৈরি করেন তাঁদের এই জগৎটা কত বড়। আমরা নাগালই পাব না।
—তোর নাগালে যেটা আছে সেটার স্প্যানটা আরও একটু বড় করলে ভালো হত না?
—তুমিও চিত্রার মতো কথা বলছ। স্প্যান বড়ো করা মানে কি? আরও পড়াশোনা করা? শুধু মোটা টাকার চাকরির জন্য?
—না। মোটা টাকাটা কথা নয়, যদিও সেটার দরকার আছে। আমি তোকে এর আগেও বলেছি, এখনও বলছি—গানটাকে নিজের ভেতরে স্বার্থপরের মতো লুকিয়ে রাখবি চিরকাল? তোর সেই স্প্যানটাকে বড়ো করলে বুঝতে পারতি সেখানে বহুমানুষের আশ্রয়টাকে তুই দিচ্ছিস না। সেটা দিবি না পালক?

পালক হঠাৎ চুপ করে গেল। ওর চোখ দুটো আর কথা বলতে চাইছে না। এর আগেও সম্বিত ওকে বহুবার বুঝিয়েছে গানটাকে ছাড়িস না, ওটা সবার থাকে না। কিন্তু পালক আর গান গায় না। সেই ছোট্টবেলা থেকেই আসে মেয়েটা তাদের বাড়িতে। তখন বলা - কওয়ার ধার ধারত না, গেয়ে দিত। কোথা থেকে যে কী বিদ্‌ঘুটে ঘটনা ঘটে গেল। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করা যায় না। সেটা কে বোঝাবে এই অবুঝ মেয়েটাকে। সম্বিত সবই জানে। কিন্তু পালকের সামনে পাখি বা কণিষ্ককে নিয়ে কোনো কথাই সে বলে না। সে হার্ট স্পেশালিস্ট। কিন্তু শুধুই জৈবিক হৃদয় নিয়ে সে সীমাবদ্ধ থাকে না। মস্তিষ্কের কিছু আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ, যা হৃদয়ঘটিত বলেই আপাত অর্থে মনে হয়, সে বিষয়েও গভীর পড়াশোনা আছে তার। বলা বাহুল্য এই পড়াশোনার শেষ নেই।ঃ অমরজিৎ কউড়, সম্বিতের স্যার এবং মন্ত্রদাতাগুরুই তাকে বলেছিলেন,

—আসলে হলো মস্তিষ্ক। স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণী ক্ষেত্র। সে যেমনটা ভেবে রেখে দেয় তেমনটাই ঘটে। শুধু হার্ট নিয়ে বসে থাকলে তুমি অলিন্দ নিলয়েই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। মনে অর্থাৎ মস্তিষ্ককে অবহেলা করলে সেটাও জলে। আসলে এ বিষয়ে কোনো স্পেশালিস্ট হয় না, বুঝলে। হওয়া সম্ভবও নয়। তবু যতটা জানা যায়, ততটা জানতে দোষ কী? যাঁরা এ বিষয়ে স্পেশালিস্ট তাঁরাও জানাবারই চেষ্টা করে এসেছেন, এখনও করছেন।

নেটে সেরকমই একটা সাইট খুলে জ্ঞানের পরিধি বাড়াচ্ছিল সম্বিত। চিত্রার পড়ান শেষ হয়নি। অতএব এ ঘরে পালকের অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব। ছোটোবেলা থেকেই তার সুন্দর করে মলাট দেওয়া বইগুলো ঘাঁটা পালকের অভ্যাস। বহুবার বকা খেয়েও পালক নিরস্ত হয়নি। সম্বিতের টেবিলটা এখনও পালকের কাছে এক বিস্ময়ের জগৎ। তবু মেয়েটার মধ্যে এই ছেলেমানুষীটা রয়ে গেছে। কিছু কিছু ছেলেমানুষী ধরে রাখা উচিত। পালকও হয়ত এখানে সেটাই ধরে রেখেছে। বরং সম্বিতের নিজের বোনটার মধ্যেই অতিরিক্ত পরিণত মনস্কতা এসে গেছে। তখনই কেমন

একটা গম্ভীর গম্ভীর ভাব।

—আচ্ছা, সম্বিত, তোমার জন্মদিন কেমন করে কাটাতে ইচ্ছে করে?

পালকের বিচিত্র প্রশ্নটায় হেসে ফেলল সম্বিত,

—কী জানিরে? ভেবে দেখিনি তেমন ভাবে?

—এত কম ভাব কেন বলত?

—দরকার হয় না। তুই একাই তো সব ভাবনা ভেবে ফেলিস।

—জন্মদিন কাটাতে হয় একলা।

—তুই বুঝি তা-ই কাটাস? কাকিমাতো প্রত্যেক বছরই বেশ ভুরিভোজের আয়োজন করেন।

—সেটা মার ব্যাপার। আমার মনে হয়, জন্মদিনটা একলা কাটালে সেটার গুরুত্ব মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। অনুষ্ঠানে সেই বোধটা চাপা পড়ে যায়।

—কেমন? একটু ভালো করে বোঝা।

—আমিই কি আর তেমন বুঝি ছাই। তবু মনে হয়, এই জন্মটার দরকার একটা আছেই।

চিত্রা ঘরে ঢুকল। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেজাজ খারাপ। পালক ওকে দেখেই বলে উঠল,

—মাসের সতেরো, আজও পুরো দক্ষিণা পাসনি নিশ্চয়ই।

চিত্রা ধমকে উঠল,

—মোটেই না। আমি প্রফেশানালিজম্ মেইনটেন্ট করি। চল্, মা ডাকছে।

—তাহলে কাকিমা ঘুগনি বানিয়েছে, যা তোর কঠিন অপছন্দের।

চিত্রা কোনো উত্তর না দিয়ে পালককে নিয়ে মার কাছে গেল। সম্বিত জানে চিত্রার মেজাজ কাল রাত থেকেই বিগড়ে আছে। প্রভামাসি মাকে চিত্রার জন্য একটা বিয়ের সম্বন্ধ দিয়েছে। যদিও মা ছাড়া আর কেউই এব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। চিত্রাটা পড়াশোনায় ভালো। গত বছর এম. এস. সি পাশ করল। অংকে ফাস্টক্লাস পাওয়া একটা মেয়ে কেরিয়ার নিয়ে ভাববে, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মার মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করে। চিত্রা এখন বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্কুল সার্ভিসের প্রথম ধাপটা পেরিয়েওগেছে। ইন্টারভিউটা এখনও হয়নি। চিত্রার লক্ষ্য কলেজসার্ভিস কমিশানের পরীক্ষা দেওয়া। জোরদার প্রস্তুতিও নিচ্ছে মেয়েটা। সম্বিত আর তার বাবা সম্পূর্ণ সমর্থন করে ব্যাপারটাকে। আজকাল কোনো মেয়েই এত সহজে বিয়ে করতে চায়না। স্বনির্ভরতা সবার ক্ষেত্রেই দরকার। আর চিত্রা যে কখনই এই বিয়ের ব্যাপারে রাজি হবে না, সেটা সম্বিত ভালোভাবেই জানে এবং রাজি না হবার কারণটা অযৌক্তিক নয়। বিশেষ করে তারা একটা সময়ে বেশ অর্থ কষ্টে কাটিয়েছে। সেই অতীতটাকে ভোলার মেয়ে চিত্রা নয়। মা অবশ্য সম্বিতকেও ছাড়ে না। কিন্তু বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছে বলেই হয়ত, এখন তার ওপর অত্যাচারটা কমেছে। যেন একটা মানুষ জীবনে অর্থসংস্থান করতে পারলেই সেটাকে প্রতিষ্ঠা বলে ধরে নিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে বিয়ে নামক মোক্ষটি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষ যে সারা জীবন ধরে একটু একটু করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেটা অনেকবার মাকে বলেও সে বোঝাতে পারেনি। তারকেশ্বরের জমিটা তার ডাক্তারি পড়ার খরচ যোগাতে বাবাকে বাধ্য হয়ে বিক্রী করতে হয়েছিল নিজেরই বড়ো দাদার কাছে। বলাবাহুল্য, ন্যায্য দাম পায়নি বাবা। এই ভাড়া বাড়িটাতেই জীবনের এতটা সময় কেটে গেল। সম্বিত ভেবে দেখেছে, সবার আগে তাদের একটা বাড়ি দরকার। ওর অবশ্য ফ্ল্যাটেও আপত্তি নেই। বাবার বাগানের সখের কথাটা মাথায় রেখেই সে বাড়ি তৈরির কথা ভাবছে। কৃষ্ণেন্দুকে একটু খোঁজ খবর নেবার কথা বলেওছে। তবে ওর ওপর ভরসা রাখা মুসকিল। এত অস্থির ছেলেটা। অথচ কী সুন্দর ছবি তোলে। ওকে একটা টেকনিকাল কোর্সের কথাও বলে ছিল সম্বিত। বাবু এখন সেই ফিকিরেই আছেন। সম্বিতের মাঝে মাঝে অবাক লাগে— তার চারপাশে কতগুলো মানুষ কী ভীষণ প্রতিভা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কেউই নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে না। সে নিজেই কি পারছে তার সবটুকু উজাড় করে দিতে? সেদিন স্যারের সঙ্গে এইসব কথাই...হঠাৎ হোঁচট খেল সম্বিত। সেদিন দরজাটা খুলে মধুরা তার দিকে এমন অবাক হয়ে চেয়েছিল কেন? এমন তো নয় যে, মধুরা তাকে চেনে না বিশেষ আলাপ না থাকলেও মেয়েটা তাকে বহুবারই দেখেছে। একটু অন্যমনস্ক লাগছিল বটে মধুরাকে। হয়ত সেকারণেই ঠিক বুঝতে পারেনি। যে যার জগতে তারা এমন ভাবে থাকে যে সেখানে অন্য কেউ বিন্দুমাত্র জায়গা পায় না। মধুরার জগতে জায়গা পাবার কারণ বা দরকার কোনোটাই সম্বিতের নেই। তার জগতেও কি কেউ জায়গা পায় সেভাবে? এখনও পর্যন্ত কেউ না। সেখানে সেও মধুরার মতোই সম্পূর্ণ অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকায়, চেনা মানুষকেও চিনতে পারে না। এখনও তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টানা টানা চোখের ছেলেটাকে চিনতে একটু সময় লেগে গেল। ছেলেটার মুখে অদ্ভুত একটা অপেক্ষার হাসি। ঘোর কাটিয়ে সম্বিত বলে উঠল,

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিসরে শাক্য?

—যতক্ষণ তোমার ঘোর লেগেছিল। কী অত ভাব?

—আরেধূর। সব বাজে কথা। তারপর খবর বল, তোর স্কুলের কী ছুটি না কি?
—ওই পরীক্ষা শেষের ফাঁকে চলে এলাম দুদিনের জন্য। গত কালই এসেছি।
—আর আজই এখানে?
—এখানে একবার না আসলে ঠিক ভালো লাগে না। তবে এবার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।
—ভালো করেছিস। মানুষটা তোকে ছাড়া বোধহয় একটু লোনলি ফিল করেন। আমি যখন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যাই, মেসোমশাইয়ের সঙ্গেও দেখা করে আসি। এবার অবশ্য গিয়ে দেখি তোদের বাড়ি বেশ ভরা ছিল। জাহ্নবীরা এসেছিল।
—দাদাও এসেছিল। তবে একদিনের জন্য। এবার থেকে ভাবছি বাবাকে আমার এখানেই নিয়ে রাখব। তবে একটা সমস্যা। ওখানে চট করে ডাক্তার পাওয়া কঠিন। বয়স হচ্ছে, শরীর টরীর খারাপ করতে পারে। আচ্ছা সম্বিতদা, তুমি আমার ওখানে একটা চেম্বার কর না। মাসে না হয় দুদিন গেলে। তাতেও অনেকটা ভরসা পাওয়া যায়।
—কথাটা মন্দ বলিসনি। ভেবে দেখব। তবে মেসোমশাই তোর কাছে থাকলে এমনিতেই ভালো থাকবেন। বৃদ্ধ বয়সের সবচেয়ে বড়ো অসুখ কী জানিস? একাকীত্ব। একা কিছু করতে না পারার ভয়।
—সেদিক দিয়ে দেখলে বাবার মানসিক একাকীত্ব খুব একটা নেই। বরং অপছন্দের ভীড়টাকেই বাবা অ্যাভয়েড করতে চায়।
—অপছন্দের ভীড়টা না হয় সেদিন দেখে এসেছি। কিন্তু মানসিক একাকীত্ব নেই একথাটা ঠিক বুঝলাম না।
—জান না? মধুরাদি আমাদের আবাসনের যাঁরা একা থাকেন বা একাকীত্বে ভোগেন তাঁদের নিয়ে একটা বিচিত্র প্ল্যান করেছে। কিন্তু প্ল্যানটা স্পষ্ট করে কিছুতেই বলছে না। বাবা, কউড় আঙ্কেল আর মধুরাদি কালকে আমাকে বলল, যদি জানতে চাও তবে কমিটির মেম্বার হতে হবে। প্রতি সপ্তাহে আসতে হবে এবং যেখানেই থাক সেখানে থেকেই কিছু দায়িত্ব নিতে হবে— এই শর্তে রাজি থাকলে তবেই প্ল্যানটা জানতে পারা যাবে।
—বাহ্। চমৎকার প্রস্তাব। তুই রাজি হলি না।
—রাজি। কিন্তু ওখানকার ফ্রিকোচিং ছেড়ে প্রতি সপ্তাহে আসার ব্যাপারটায় একটু ঝামেলায় পড়ে গেছি। তাই ভাবছি।
—তবে মেসোমশাইকে তোর ওখানে নিয়ে যাবার কথা ভুলে যা।
—কেন?
—ওই প্ল্যান ফেল করবে না।
—কী করে বুঝলে? তুমিও আছ নাকি কমিটিতে?
—না। অইফশিয়ালি প্রস্তাবটা আসেনি। ইন্যফ্যাক্ট তোর কাছ থেকেই ব্যাপারটা জানলাম। তবে প্রস্তাব আসলে দ্বিতীয়বার ভাবব না।

।। নয়।।

অনিচ্ছা থাকাসত্ত্বেও বইয়ের র‍্যাকটা আজ পরিষ্কার করতে হচ্ছে পালককে। মা খুব বকেছে আজ। অনেকদিন এই বকুনিটা শুনেও না শোনার ভান করেছিল সে। কিন্তু কত আর কানের কাছে গজর গজর শুনতে ভালো লাগে? মা তো আর কোনোদিনই বুঝবে না, কেনো সে বইয়ের র‍্যাকটা ধরতে এত ভয় পায়। শুধু মা কেন, কেউই কোনোদিন বুঝবে না, বোঝেওনি। র‍্যাকটার ওপরের তাকটায় গীতবিতানটা রাখা, পাশে গানের স্বরলিপি লেখা ডাইরি, আর সেগুলোকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আছে প্যাকেটটা—অগুনতি চিঠি রাখা আছে তাতে। সবকটাই তার লেখা। চিঠিগুলো কণিষ্কের ছোঁয়া নিয়ে আজও একইরকম ভাবে রয়ে গেছে। কণিষ্ক বরাবরই খুব সাবধানী। এই অধরা ছোঁয়াটুকু ছাড়া তার আর কোনো চিহ্ন নেই। শুধু একটা জন্মদিনের কার্ড আছে। নিতান্তই সাধারণ তার আঙ্গিক ও ভাষা। কিন্তু সেই তারিখটা পালকের জীবনে প্রথম একটা স্পর্শ এনে দিয়েছিল। অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিল সেদিন। সবার আড়ালে কীভাবে যেন এই বইয়ের র‍্যাকটা সামনেই তাকে একলা আবিষ্কার করতে পেরেছিল কণিষ্ক। ওর চোখ দুটোর দিকে তাকাতে পারছিল না। পালক। ভয় লজ্জা আনন্দ সব যেন একাকার হয়ে যাচ্ছিল তার ভেতরে। কণিষ্ক যখন পালকের হাত দুটো ধরে একঝট্‌কায় বুকে টেনে নিল্ তখন ওর চোখ বুঁজে ফেলেছে। শুধু বুঝতে পারছিল তার নিশ্বাস উষ্ণ হয়ে উঠেছে, বুকের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় করা শব্দ, সে কণিষ্কের ঠোঁটের ছোঁয়ায় ডুবে যাচ্ছে কোনও এক অজানা অতলে। ঘনিষ্ঠ সে চুম্বন বড়ো দীর্ঘ ছিল, ছিল ডালিমকুমারের দেশের অন্তহীন রূপকথার মতো। তার চুলে নরম করে হাত বুলিয়ে ঘাড়ের কাছে ঠোঁট ডুবিয়ে কণিষ্ক বলেছিল,
—তোর জন্য শুধু একটা কার্ড এনেছি। আর যা কিছু আমার দেওয়ার ছিল তাই দিয়ে তোকে ভরিয়ে দিলাম।
পালক যখন চোখ খুলেছে তখন তার গাল ভিজে গেছে জলে। কণিষ্ক তার দিকে তখনও একইভাবে চেয়ে আছে। তাকে বুকে মিশিয়ে নিতে নিতে বলেছিল,

—একটা গান গাইবি পালক? শুধু আমার জন্য। আজ আর কেউ শুনবে না।

না, কেউ শুনতে পায়নি, পালক তার আঠেরো বছরের জন্মদিনে যে গানটা গেয়েছিল। এত খাদে গলা নামিয়ে সে কখনও এর আগে গান গায়নি। আর কোনো দিনই সেই গানটা গাইতে পারবে না পালক। শুধু সেই গানটা কেন, কোনোও গানই গাইতে পারবেনা সে। তার সব গান কণিষ্ক নিয়ে নিয়েছে, আর এমনভাবে নিয়েছে যে সে টেরও পায়নি। গানগুলো শুধু লেখা আছে গীতবিতানে। অথচ পালক প্রথম থেকেই খুব সচেতন ছিল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কণিষ্ক যাতে টের না পায় তার মনটাকে। কিন্তু মনই সন্ধান করে নেয় তার মৃত্যুর মোক্ষম, স্থানটাকে। কণিষ্ক টের পেয়ে গেল। এখনকার বোধ - বুদ্ধিটা আগে থাকলে পালকই প্রথমে বুঝে যেতে কণিষ্ক আসলে কী চায়? তাদের সেভাবে কথা হতো না। পড়াতে পড়াতে কণিষ্কই নানা গল্প জুড়ত। কখনও সিনেমা, কখনও গান, গল্প কতকি, কণিষ্কের দিকে না তাকিয়েও পালক স্পষ্ট বুঝতে পারত কণিষ্ক গল্পগুলো তার দিকে তাকিয়েই বলছে। সে অনেক চেষ্টা করেও, সহজ হতে পারত না, তাকাতে পারতনা কণিষ্কের দিকে। বয়:সন্ধি সত্যিই কতরকম ভুল ভাবায়, ভুল দেখায়, ভুল বোঝায় এবং ভুল করায়। পালকও করেছে সেই মারাত্মক ভুল। এজীবনে সেটা আর শোধরাতে পারবে না সে। ভুলটা চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল কণিষ্কই, অন্তত এই সততাটুকু দেখিয়েছিল। সেবারের জন্মদিনের পর থেকেই খুব ধীরে ধীরে ছবিটা বদলে যাচ্ছিল। সেটা অবশ্য অনেক পরে আবিষ্কার করতে পেরেছিল পালক। সেদিন সে শুধু যৌন আবেগেই কণিষ্ক তাকে স্পর্শ করেছিল, তার মধ্যে হৃদয়বেত্তার রেশ মাত্র ছিল না — এই সত্যিটা মানতে অনেকদিন সময় লেগেছে পালকের। কণিষ্ক, নিজেই স্বীকার করেছিল,

—সেদিন তোর ওপর অন্যায় করেছি।

—শুধু সেদিন?

—মানে? আমি আর কোনদিন তোকে ছুঁয়েছি...

—ছোঁয়াটাই সব, না?

—না। অবশ্যই না। সেদিক দিয়ে দেখলে আমি তোর কাছে সম্পূর্ণ অপরাধী। কিন্তু পালক, আমি পারবনারে। পারিনি কোনোদিন পাখিকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে।

—তাহলে আমি এতদিন কী ছিলাম? পাখিকে পোষ মানানর একটা উপায়?

—খুব নিষ্ঠুর হলেও এটাইসত্যি পালক। আমি দেখতে চেয়েছিলাম...

—থাক না। কী দেখতে চেয়েছিল সেটা নিয়ে আলোচনার আর দরকার আছে কী?

—হয়ত নেই। তবু...

—জবাবদিহি? সেটারও দরকার নেই। অন্তত: একটা মানুষের কাছে তো তুমি ভীষণভাবে কমিটেড। আমাকে আশা করি তোমার সঙ্গে আর কোনও নাটক করতে হবে না।

—নাহ্। তোকে আর কষ্ট দেব না রে।

পালক শুধু হেসেছিল। কণিষ্ক অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকেছে। পাখির প্রতি ওর অনুভূতিগুলোকে যতটা মর্মস্পর্শী করেবলা যায়, বলে গেছে। কিন্তু পালককে তখন আর কিছুই স্পর্শ করছিল না। আজও পালক অনেক কিছুর স্পর্শ টের পায় না। শুধু এই বইয়ের র‍্যাকটার সামনে আসলেই একটা অশরিরীর ঘনিষ্ঠ স্পর্শ সে অনুভব করতে পারে। পালক গীতবিতানটা হাতে নিল। এখনও কেন যে এই বইটাকে ছুঁলে তার সারাটা শরীর কাঁপে? পাতার পর পাতা জুড়ে শুধু যেন তার কথাই বলে গেছে গানগুলো কিন্তু সে যে আর শুনতে চায় না তার কথা। তার সব কথা শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু আনাচে কানাচে রয়ে গেছে পালক আজ তা-ও শেষ করবে। চিঠির প্যাকেটটা নামাল পালক। এগুলোকে সে বহুবার চেষ্টা করেছে শেষ করে দিতে, পারেনি। মধুরাদি কী একটা প্রসঙ্গে বলেছিল,

—কোনো কিছুই একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যায় নারে পালক। তুই যতদিন থাকবি, ততদিন সেগুলোও থাকবে। থেকেই যাবে।

পালক জানে মধুরাদি কেন কথাটা বলে। খুব স্পষ্টভাবে না হলেও মৈনাকদার কথা আবীরা একবার বলেছিল। হয়ত সেকারনেই মধুরাদি তাকে কিছুটা হলেও বোঝে। কিন্তু আজ আর কারোর কথাই সে ভাববে না। চিঠিগুলোকে শেষ করতেই হবে। কী করবে? পুড়িয়ে ফেলবে? ছাই হয়ে যাবে তার নিষ্পাপ মনটার হরফগুলো। কিন্তু পোড়ালে হয়ত বাড়িতে টের পেয়ে যাবে। শেষকৃত্য নিঃশব্দে করা যায় না। তাহলে কি ছিঁড়ে ফেলে দেবে? আবর্জনা হয়ে যাবে তার শ্বাস - প্রশ্বাসগুলো। আবর্জনাই বটে। চিঠিগুলো ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না পালক। কোথায় একটা আধটা ছেঁড়া অংশ পড়ে তাকবে? কে দেখবে? নাহ্! অন্যকিছু ভাবতে হবে। পালক একটা বালতিতে জল এনে ধীরে ধীরে চিঠিগুলো জলে ভিজিয়ে কাগজগুলোকে এই প্যাকেটটাতে সাবধানে ভরে তুলে রাখল ওপরের র‍্যাকে। রাত্রে ছাদে উঠে বাড়ির পাশের প্রায় বুজে আসা পানা পুকুরটাতে ফেলে দেবে। তলিয়ে যাবে ওটা আস্তে আস্তে। প্যাকেটটা কি আবার ভেসে উঠবে? মধুরাদি হয়ত ঠিকই বলেছিল।

—কোনো কিছুই নিশ্চিহ্ন করা যায় না।

পালক ওর বইয়ের র‍্যাকটা সুন্দর করে গোছাল। আর হয়ত কখনও এত সুন্দর করে সে র‍্যাকটাকে গোছাতে পারবে না। শুধু গীতবিতানটাই বিছানাতে রয়ে গিয়েছিল। সেটাকে রাখতে গিয়ে পালক বুঝতে পারল, সে দাঁড়াতে পারছে না। গীতবিতানটাকে বুকে জড়িয়ে সে ক্রমশ দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। মেঝেতেই শুয়ে কুঁকড়ে যেতে যেতে একরাশ গানের মধ্যে পালক অশরিরী কান্নায় শেষ হয়ে যেতে লাগল।

।। দশ।।

রেবতী মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলেন তার ছোটো মেয়েটার দিকে। মেয়েটার মুখটায় এখনও কোনো পাপবিদ্ধতা স্পর্শ করেনি। সরল, সজীব, নিষ্পাপ সুন্দর একটা মুখ। ওর জন্মটা হয়ত সমাজের কাছে কলঙ্কিত, কিন্তু ওর মধ্যে সেই কলঙ্কের রেখাপাত ঘটেনি, ঘটতে দেওয়া হয়নি। রেবর্তী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বোলপুরে এসেছিলেন পুষ্পরাগের ওপর অন্ধ অভিমানে। স্থির সিদ্ধান্ত তখনও নিতে পারেননি রেবতী। কলকাতার থেকে এখানে তাঁর পরিচিতি অনেক বেশি ও বিস্তৃত। সবচেয়ে বড়ো কথা সেই পরিচিতি সম্ভ্রমের। এখানে এসে ঝোঁকের মাথায় পুষ্পরাগকে ফোনে জানিয়েছিলেন, এই সন্তানের দায়ভার তিনি একাই নেবেন। অমরজিৎকেও একই কথা বলেছিলেন। পুষ্পরাগ বারবারই বলেছিল,

—সন্তানের জন্ম দেওয়াটা দায় নয় রেবতী। ওটা মাতৃসত্তার একটা স্তর।

ভীষণ সাজান গোছানো মনে হয়েছিল পুষ্পরাগের কথাগুলো। কিন্তু এতটাই অবসন্ন লাগত তখন যে পুষ্পরাগের কথার পাল্টা জবাবটা পর্যন্ত দিতে ইচ্ছে করেনি। পুষ্পরাগ কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেও নিয়মিত তাঁর খোঁজ নিত। অমরজিৎ তাঁকে সল্টলেকের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এমনিতেও যেতে হত। ডাইভোর্সটার জন্য। মিউচুয়াল সেপারেশানে বেশিদিন লাগার কথা নয়। সেটা এক দুদিনের যাতায়াতে হয়ে যেত। কিন্তু একটু বেশি বয়সের ইস্যু বলেই আবীরার ক্ষেত্রে তাঁর বেশ ক্রিটিক্যাল কমপ্লিকেসি দেখা দিয়েছিল। অমর এর আগেই তাঁকে বিচিত্র যুক্তিতে কোনঠাসা করে দিয়েছিল। আর তার ওপর শারীরিক কারনটা অমরকে বাড়তি যুক্তি যুগিয়ে দিল। তাকে থাকতে হলো সল্টলেকের বাড়িতে। মনে হত যেন এক পরিচিত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। ডাক্তার পারিশ্রমিক নেবেন না, কেড়ে নেবেন অতি কষ্টে লালিত তাঁর সন্তানটিকে। আবীরার জন্ম দুটো মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র চিনিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। ডঃ অমরজিৎ কউড়ের আপাত শান্ত, নিরীহ চেহারাটার পেছনে লুকিয়ে থাকা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা পরায়ণ একটা মুখ। আবীরাকে না দিলে ডিভোর্স পাবেন না রেবতী, খুব শান্ত, শানিত গলায় জানিয়ে দিয়েছিলেন অমরজিৎ। আর পুষ্পরাগ সে সময়ই কেমন আশ্চর্যরকম বদলে গেল। জীবনে ওই একবারই পুষ্পরাগকে আবেগপ্রবণ হতে দেখেছিলেন রেবতী। একদিকে মধুরার মা ডাক, অমরের নিলিপ্ত চিকিৎসা পরায়ণতা, আবীরার সদ্যজাত শিশুদেহ অন্যদিকে পুষ্পরাগের আগ্রাসী অভিমানের আহ্বান— শেষ পর্যন্ত পুষ্পরাগকে ফেরাতে পারেননি রেবতী। নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে একা হয়ে চলে এসেছিলেন পুষ্পরাগের কাছে। আরেকটা থিসিস পেপারের কাজে পুষ্পরাগ তখন বোলপুরে। সেখানেই রেবতী বিয়ে করলেন পুষ্পরাগকে। বিষন্ন অবসাদ কেটে যাচ্ছিল পুষ্পরাগের আবেগমোহিত আচ্ছাদনে, — পৌরুষের সেই ঘনায়মানয়তায় ধীরে ধীরে সমঋক্ত হয়ে যায়। দুজন পুরুষের সঙ্গে তিনি ঘর বেঁধে ছিলেন। বাঁধন থাকলনা, শুধু ঘরখানা একলা হয়ে রয়ে গেল তাঁর জন্য। থিসিসের পেপার জমা দেবার পর পুষ্পরাগ ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে গেলেন। তাঁকে বলেছিল সঙ্গে যেতে। কিন্তু এখানে গিয়েও যে বরফের শীতলতাতেই ডুবতে থাকবে তাঁদের সম্পর্ক সেটা বুঝতে পেরেছিলেন দুজনেই। তাই এখনকার মতো মাস কয়েকের জন্য যাতায়াত, কয়েকটা পেগের আচ্ছন্নতার পরিমাপের ঘনিষ্ঠতা— এটাই স্বাস্থ্যকর মনে হয় তাঁদের দুজনের কাছেই। নৈকট্য যে ভীষণ বেশি চিনিয়ে দেয়, তিক্ততা বাড়ায়— বোধহয় সেটাকেই ভয় পেয়েছিলেন রেবতী।

—কী রে। তখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? ফ্রেশও হোসনি এখনও।

আবীরা যেন তার মায়ের প্রশ্নটা শুনতেই পেল না। তন্ময় হয়ে কাঁচের শার্সি দিয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। এই প্রকৃতির কোনো অংশই মানুষকে আচ্ছন্ন না করে পারবে না—এত সুন্দর। রেবতী রোজই দেখেন, তাই এখন আর আলাদা করে রোমাঞ্চিত হন না। তবে তাঁর ঘরের এই জানলাটার একাট অদ্ভূত আকর্ষণ আছে বোধহয়। পুষ্পরাগও এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে বসে থাকে। তখন তাকে কেমন যেন ধ্যান বলে মনে হয়। মেয়েটাও কি সেরকমই হলো নাকি। রেবতী মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন। আবীরা যেন একটু চমকে উঠল,

—ওহ্। তুমি।

—এখানে আর কে হবে?

—এখান থেকে দূরটা দেখতে কী দারুণ লাগে মা। আমার তো মনে হয়, আমি এখানেই সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

—যা মনে হয়, তা কি সবসময় সম্ভব হয়রে পাগলি?

—না হওয়াই তো ভালো। তানা হলো পুরো রোমান্টিসিজমটাই মাটি।
—তুইও বুনো হয়ে যাচ্ছিস।

গজ দাঁতের অপূর্ব হাসিটা হেসে মায়ের কাঁধে মাথা রাখল আবীরা। রেবতী একটা শিহরণ টের পাচ্ছিলেন। এটাই বুঝি অপ্রতিরোধ্য সন্তানস্নেহ। মধুরা বড়ো হবার পর যা তাঁকে কোনওদিনই দেয়নি। ওর সবটুকু দখল করে আছে অমর। আবীরাটাকে যে আজ তাঁর সবটুকু দিয়ে দখল করে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। মেয়ের মাথায় আলতো হাত বোলাতে বোলাতে বললেন রেবতী,
—থাকবি আমার কাছে? থেকে যা না।
—আছিই তো মা।
—এভাবে নয়। তুই আমার কাছে থাক। কীরে থাকবি না?
—দিদি অ্যালাও করবে না মা।
—কেন? অ্যালাও করবেনা কেন? তুই তোর মার কাছে থাকবি, এতে মধুরার আপত্তির তো কিছু নেই।
—হয়ত নেই। তবু করবে না।
—না করলেও তুই শুনবি কেন? তুই অ্যাডাল্ট। তোরও একটা নিজস্ব মতামত আছে।
—নিশ্চয়ই আছে মা। আর সেই মতামত দেওয়াটা আমার পক্ষে খুব কঠিন।
—কেন? কঠিন কেন?
—দিদিও যে আমাকে তোমার মতোই ভালোবাসে মা।

রেবতী অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন আবীরার দিকে। মধুরা তার বাবার মতোই পুরোটা। এতটুকু অংশও কী নেই ওর মধ্যে? ওর রক্ত কোষ ধমনী শিরায় কোথাও রেবতী নেয়? নাহলে অমরের নিষ্ঠুরতার অবিকল ছাপ মধুরার মধ্যে আসে কীভাবে? ও কি নিজের মার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে চায়? তাঁর সন্তানের কাছে তিনি শুধুই একজন প্রতিযোগী? আর কিছু না? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন রেবতী,
—সেই কখন এসেছিল, এখনও মুখে কিছু দিসনি। আয়, খাবি আয়। তোর ফেভারিট মাশরুম স্যালাড বানিয়েছি।

আবীরা তার নতুন ক্যাপ্রিটা পরে আয়নায় নিজেকে দেখছিল। কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। কিন্তু তাকে দেখতে বেশ লাগছে। খুশি খুশি ভাবটা নিয়েই ও চুলটায় ব্রাশ বোলাচ্ছিল তখনই কলিং বেলের শব্দটা তার কানে এল। মা তাকে আগেই বলে রেখেছিল মিস্টার পুষ্পরাগ দত্ত আজ আসবেন। কথাটা সে দিদিকে জানিয়েই এসেছে। দিদিও কোনো আপত্তি করেনি। তবু একটা অস্বস্তি ছিল আবীরার মধ্যে। কলিং বেলটার শব্দে সেটা আরও বেড়ে গেল। ধূর। এখন মার কাছে না এলেই ভালো হত। গুনতে সে বার দুয়েক দেখেছে ভদ্রলোককে। মা যখন কলকাতায় যায় প্রত্যেকবারই আবীরা মার সঙ্গে দেখা করে। সেরকম দেখা করতে গিয়েই সাক্ষাৎ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে যদিও আলাপটা ভীষণ রকম ফর্মাল ছিল। এমনিতে বেশ ডিসেন্ট লুকিং লোকটা, কিন্তু ভীষণ কম কথা বলেন। কিছুতেই প্রেডিক্ট করতে পারেনি আবীরা পুষ্পরাগ দত্তকে। দেখা যাক, এবার বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। হঠাৎ আবীরার মনে হলো সে ভদ্রলোককে কী বলে সম্বোধন করবে?

মায়ের ড্রয়িং রুমটা একটা আর্চ পার হয়ে ডাইনিং রুমের সঙ্গে মিশেছে, পাশে কিচেন। পুরো বাড়িটাই ভীষণ সুন্দর করে সাজান। বাড়িতে ঢোকার গেটটা পর্যন্ত লতানো গাছের পাতায় ঘেরা। মাঝখানে নুড়ি পথ দুপাশে বাগান। ডানদিকের বাগানটায় একটা শেড দেওয়া বাঁধান চাতাল আছে। সে বড়ো হয়ে মাকে গান শেখাতে দেখেনি। কেন যে শেখায় না মা? এখনও বেশ ভালো গান করে। ঘর সাজানটা বোধহয় দিদি মার কাছ থেকেই ইনহেরিট করেছে। দুজনেরই সাজ আর সাজানর ধরণ প্রায় একরকম। আবীরা দেখেছে, অজান্তেই মার সঙ্গে দিদির একটা তুলনা সে করে ফেলে। আবীরার সামনে মা এখন তারই পছন্দের নানা আইটেম সাজিয়ে দিচ্ছিল। স্যালাডটা দারুণ হয়েছে। খেতে খেতেও ওর চোখ মাঝে মাঝেই এপাশ ওপাশ ঘুরছিল। একটু দ্বিধা নিয়েই সে মাকে জিজ্ঞেস করল,
—উনি খাবেন না?
—কে উনি? ওহ্ পুষ্পরাগ? ফ্রেশ হয়ে আসুক। তারপর আমরা একসঙ্গেই খাব।
মুহূর্তে সুস্বাদু খাবারগুলো কেমন বিস্বাদ লাগতে শুরু করল আবীরার। 'আমরা একসঙ্গে...' মানে মার কছে সেই এই বাড়ির অতিথি। আরও কিছুক্ষণ প্লেটের স্যালাডটা নাড়াচাড়া করে শুধু জুসটা খেয়ে উঠে পড়ল সে। রেবতী হাঁ হাঁ করে উঠলেন,
—ওমা। উঠছিস কেন? এখনও তো প্রণটা টেস্টই করলি না। কত কষ্ট করে বানালাম তোর জন্য।
—ইচ্ছে করছে না মা।
—বললেই হলো ইচ্ছে করছে না। সেই কখন খেয়েছিস। মার হাতের রান্না ওভাবে ফেলে উঠতে নেই।
—প্লিজমা। তুমি টিপিক্যাল মাদের মতো কথা বলোনা।
—এ আবার কীরকম বেয়াদবি আবীরা?

—সরি। আমার এখন সত্যি খিদে পাচ্ছে না। পরে ডিনারে খুব করে খাব। আফটার অল্ আমার মা এত কষ্ট করে স্পেশাল ডিশ বানিয়েছে আমার জন্য।

—এখন বুঝবি না। মা হলে বুঝতে পারবি এতে আমি কতটা কষ্ট পাচ্ছি।

—এবার কিন্তু তুমি আমায় কন্‌ফিউস্‌ড্ করছ মা। তোমার কোনটাতে কষ্ট হচ্ছে—আমি খেতে চাইছি না, এই ব্যাপারটায়? না, তুমি কষ্ট করে রান্না করেছ অথচ তা তোমার পারপাসটা ফুলফিল্‌ড্ করছে না, সেটায়?

রেবতীর ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল মেয়ের গালে একটা চড় মারতে। মধুরা এখানেও রেহাই দেয়নি তাঁকে। আবীরার এই কথাগুলোতে মধুরার ছাপ স্পষ্ট ততক্ষণে আবীরা আবার তার মায়াবী নিষ্পাপ হাসিটা হেসে বলল,

—কাম অন্ মা। এত রেগে যাচ্ছ কেন? তুমিই তো বলো আমি অ্যাডাল্ট হয়েছি। সো? আমার এখন কিছুটা সময় নিজের সঙ্গে কাটাতে ইচ্ছে করছে। আশা করি তুমি মাইন্ড করবে না। তাছাড়া উনি এতদূর থেকে এতদিন পরে এসেছেন। তোমাদেরও তো একটা পার্সোনাল টাইম দেওয়া উচিত, যাতে তোমরা একসঙ্গে কিছুটা সময় নিজেদের মতো করে কাটাও। অ্যান্ড ইট শুড বি আ কোয়ালিটি টাইম।

আবীরা যখন ওর নির্দিষ্ট ঘরে যাচ্ছিল তখন দেখল পুষ্পরাগ দত্ত ড্রয়িংরুমের সোফাটায় বসে। হয়তো মা-মেয়ের কথাগুলো শুনেছেন। শুনলেও ক্ষতি তো কিছুনেই। সে তো কোনো অফেন্সিভ কিছু বলেনি। যদিও রেবতীকে দেখে সেটা মনে হচ্ছিল না। তিনি তখনও ডাইনিং টেবিলের পাশ থেকে নড়তে পারছিলেন না। এই তাঁর আবীরা? কী বলতে চাইল ও? ওকে কোয়ালিটি টাইম দেবার নেই ওর মায়ের? নাকি সেটার দরকার বোধ করে না আবীরা?

পুষ্পরাগ সোফায় বসে তাঁর চিরন্তন পানাভ্যাসের আয়োজন করছে। সুদৃশ্য গ্লাসে পানীয় ঢালছে। ড্রিংক বানানো শেষ করে ডাকল,

—কী হলো? এখনও দাঁড়িয়ে?

—আসছি।

—এবারেরটা আগে কখনও টেস্ট করোনি। যদিও ভদ্‌কা নয়, তবু তোমার ভালো লাগবে বোধহয়। একটু বেশি স্ট্রং অবশ্য।

রেবতী যেন এই মুহূর্তে সেটাই চাইছিলেন। একটু ঘোর। ফ্রুট স্যালাড আর বেক্‌ড্ প্রণ নিয়ে পুষ্পরাগের পাশে বসলেন। পুষ্পরাগ ফ্রুট স্যালাজ ছাড়া ড্রিংকের সঙ্গে অন্য কিছু তেমন পছন্দ করেনা। আজ বাড়তি একটা ডিশ দেখে বলে উঠল,

—এতা গ্রান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট।

—ছিল। তাই নিয়ে এলাম। ইচ্ছে না করলে খেওনা।

—আচ্ছা তোমার এত হেজিটেশান কীসের রেবতী? মেয়ে এসেছে, তাই স্পেশাল কিছু তো করতেই পার।

আজ রেবতী একটু দ্রুতই পান করছিলেন। দুটো শসার টুকরো তুলে বলে উঠলেন,

—এর থেকে ভালো হয়, ওকেই বরং ডাকি। তোমার নিজেরাই ডিসাইড করো কার জন্য আমি স্পেশাল ডিশ বানিয়েছি।

—একটু আস্তে সিপ্ দাও। এটাসত্যিই স্ট্রং।

—অদ্ভুত কমপ্লেক্স দুজনের।

—কমপ্লেক্স? আমার? ওরও তো তেমন কিছু আছে বলে মনে হলো না। কোয়াইট ম্যাচিওর্ড আবীরা। বলতে পারে কমপ্লেক্সটা তোমার মধ্যে কাজ করছে। আমাদের নয়।

রেবতী যেন একটু থমকে গেলেন পুষ্পরাগের মুখ থেকে 'আমাদের' কথাটা শুনে। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর স্নায়ু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলাতে পারলেন না, একটু উঁচু গলাতে বললেন,

—তাহলে ডাকই না হয় নিজের মেয়েকে। ড্রিংকও অফার করো।

—তোমার বা তার আপত্তি না থাকলে আমার ডাকতে কোনো অসুবিধে নেই।

—নিজের মেয়ে বলে স্বীকার করলে ডাকতে পারতে না পুষ্পরাগ।

—তুমি আর নিও না রেবতী। আর যেটা বল্‌লে, পরে একটু ভেবে দেখো, ওকে নিজের মেয়ে বলে স্বীকার করার সুযোগটা তুমি তো দাও নি আমায়।

—আমি দিই নি?

—না। মনে করে দ্যাখো, ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন তুমি কনসিভ করেছ, তখন আমায় কিছু বলোনি। রিং করে ছিলে অমরজিৎকে আগে।

—এটা তো জঘন্যধরনের মিথ্যে পুষ্পরাগ।

—আমি বলছিনা যে, তুমি আমাকে বলতে না। বলেওছ। কিন্তু কখন? অমরজিতের সঙ্গে কথা বলেও নিজে

সিদ্ধান্ত নিয়ে— আমার মতামতের প্রয়োজন হয়নি তোমার।

দুটো পেগ আরও দ্রুত শেষ করলেন রেবতী। তিনি বুঝতে পারছিলেন, অনেক কিছুই তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিষাক্ত স্বরে বলে উঠলেন,

—কেনই বা তোমার মতামত নেব? কারণ তোমার তো চুক্তি ছিল, আমাদের কোনো ইস্যু থাকবে না।

—চুক্তিটা বোধহয় প্রেমপর্বে ছিল। প্রেমিক আর একজন পূর্ণবয়স্ক ও প্রায় বিবাহিত একজন পুরুষের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য থাকে রেবতী। তোমার মনে হয়েছিল, আমি অ্যাবর্ট করতে বলব।

—তুমি তা-ই বলতে।

—আমাকে বলার কোনো সুযোগই দাওনি তুমি। শুধু সিদ্ধান্তটা জানিয়েছিলে।

সিদ্ধান্ত জানালে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে চলে এলে।

—আমাকে সবদিক থেকে দোষী প্রমাণ করলে তোমার অনেক সুবিধে। ঝামেলা থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখাটা সহজ হয়, দায়িত্বও নিতে হয় না।

—তোমাকে দোষী ভাবলে আমাদের বিয়েটা হতো না রেবতী। দূরে তুমি রাখতে চেয়েছিলে, ভয় পেয়েছিলে যদি ওকে আমি স্বীকৃতি না দিই।

—সত্যি কথাটা বলো তো পুষ্পরাগ, সত্যিই তুমি স্বীকৃতি দিতে?

—একটা ডায়লেমা যে থাকত না, তা নয়। কিন্তু সেটা অনভিজ্ঞতার ফল। জীবনে প্রথম একটা ভীষণ অচেনা পরিস্থিতির সঙ্গে আচমকা মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি তখন ছিলনা। তার ওপর সদ্য চাকরি, তোমার সঙ্গে অমরজিতের প্র্যাক্‌টিক্যালি তখনও ডিভোর্স হয়নি— আই আয়াজ কম্‌প্লিট্‌লি কনফিউজড্। সুতরাং ডায়লেম তো থাকবেই সেই পরিস্থিতিতে। তোমারও ছিল। কোথায় থাকবে? আমার কাছে না অমরজিতের কাছে। কিন্তু সেইসবকিছুকে কাটিয়ে উঠতে পারতাম হয়ত।

—কী ভাবে?

—বিশ্বাস করবে কি? তোমাকে ধীরে ধীরে স্ফীতোদর হতে দেখে— ওর জন্মটা দেখে।

রেবতী আরেকটা পেগ নিতে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। আজ অনেকদিন পর তাঁর উন্মত্তের মতো কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। হঠাৎ-ই একটা একটা প্রশ্নে দুজনেই চমকে উঠলো। আবীরা কখন যে তার নির্দিষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে ভেনাসের বড়ো মূর্তিটার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরও পাননি তাঁরা। খুব স্বাভাবিক গলায় আবীরা বলল,

—খুব বোর হচ্ছিলাম। ইফ হউ ডোন্ট মাইন্ড মে আই জয়েন ইউ?

।। এগারো।।

কৃষ্ণেন্দুর এখন পরিশ্রমটা একটু বেশিই হচ্ছে। সম্বিতদা আর শাক্য অনেক বুঝিয়ে মা-বাবাকে রাজি করাতে পেরেছে। বেশ নাম করা ইন্সটিটিউটে সে এখন ফোটোগ্রাফির ক্লাস করতে যায়। নাম করা ইন্সটিটিউটের দামও প্রচুর। আর্থিক ব্যাপারে জ্যেঠুর সাহায্য না পেলে তার স্বপ্নটা অধরাই থেকে যেত। বাড়ি ভাড়া, দোকান ভাড়া আর তাদের নিজেদের দোকানের আয় মিলিয়েও সবদিক রক্ষা করা যেত না। কৃষ্ণেন্দু কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, আরেকটু হলেই সম্বিতদার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত। সম্বিতদাকে বেশ অস্থির লাগছিল কৃষ্ণেন্দুর। জিজ্ঞেস করল,

—কিছু হয়েছে সম্বিততা?

—তোর সঙ্গে খুব জরুরি দরকার ছিল। কিন্তু হাতে একটুও সময় নেই। তুইকি আমার সঙ্গে যেতে পারবি? খুব অসুবিধে হবে?

—না। কিন্তু কী হয়েছে...

—রাস্তায় যেতে যেতে বলছি।

কৃষ্ণেন্দু আচঁ করেছিল ব্যাপারটা সিরিয়াস। ট্যাক্সিতে উঠে গলার স্বর বেশ নামিয়েই সম্বিতদা বলল,

—ব্যাপারটা সিরিয়াস, কপ্লিকেটেড। তুই তো ডঃ কউড়ের ফ্যামিলিকে চিনিস।

—উনার ছোটো মেয়ে ডেসপারেটলি সুইসাইডাল অ্যাটেম নিয়েছে।

—মানে? আবীরা। কখন? কেন?

—বোধহয় ভোরবেলায়। স্যার দিল্লী গেছেন সেমিনারে। উনার বড়োমেয়ে মধুরা সকালবেলা বোনকে ডাকতে গিয়ে দ্যাখে এই অবস্থা। আমাকে কিছুক্ষণ আগে ফোন করল। কোনো মানে হয়। সেই মুহূর্তেই ফোন করা উচিত ছিল। জানি না গিয়ে আদৌ কিছু করতে পারব কিনা।

—মানে? আবীরা আর...

—এখনই এতটা ভাবার কিছুনেই। চেষ্টা তো একটা করতেই হবে। এসব ব্যাপারে নার্সিং হোমগুলো অ্যাডমিট করতে

ঝামেলা করে। পুলিশ কেস তো।

কৃষ্ণেন্দু আর কোনো কথা বলছিল না। তার অদ্ভুত লাগছিল। সম্বিতদাই যখন কনফিডেন্স পাচ্ছে না, তখন আবীরা মনে হয় সারভাইভ করবে না। কিন্তু কেন এরকম করল মেয়েটা? আর সেখানে কৃষ্ণেন্দুর ভূমিকাটাই বা কী? অন্তত এই ভূমিকার জন্য সে কখনও প্রস্তুত ছিল না। সম্বিতদা আবার বলে উঠল,

—ওদের বাড়ির কাছেই একটা নার্সিং হোমে আমি মাঝে মাঝে যাই। ওখানকার আর এম ও ডঃ অসিত ঘোষালের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কিন্তু উনি এখন ছুটিতে। তোর জ্যেঠুতো বেশ ইনফ্লুয়েনশিয়াল। তোকে উনাকে বুঝিয়ে পুলিসের ঝামেলাটা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্যারের নামটা জড়াতে চাইছিনা। পরে হয়ত আর চাপা থাকবে না। তবুও এখনকার মতো ব্যবস্থাটা করতে হবে। মেয়েটা কোনো সুইসাইড নোটও লেখেনি।

—শাক্য জানে?

—ওকে ফোনে অনেকবার চেষ্টা করলাম। নট রিচেব্‌ল্ বলছে।

ওরা যখন ডঃ কউড়ের ফ্ল্যাটে ঢুকলো, তখন কৃষ্ণেন্দুর মনে হচ্ছিল আর বিশেষ কিছু বোধহয় করার নেই। আবীরার সংজ্ঞাহীন মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল সেই সাজান গোছানো মুখটা সব উগ্রতা মুছে দিয়ে শেষবারের মতো একটা স্নিগ্ধতা তাকে উপহার দিয়ে চলে যেতে বসেছে। সম্বিতদা একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে নার্সিংহোমে নিয়ে গেল আবীরাকে। পুলিস সংক্রান্ত ঝামেলা মেটাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কৃষ্ণেন্দুর জ্যেঠু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মধুরাদিকে কৃষ্ণেন্দু অনেকবার দেখেছে, কথা বলেছে, কিন্তু আজ সেই পরিচিত মধুরাদিকে ঠিক যেন চেনা যাচ্ছে না। ভীষণ নির্লিপ্ত দেখাচ্ছিল মধুরাদিকে। যন্ত্রের মতো ডাক্তাররা যা যা করতে বলছে করে যাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দু মধুরাদির সঙ্গেই ছিল। সম্বিতদা এসে বলল।

—আমরা চেষ্টা করছি। অনেকটা ক্লিনিং হয়ে গেছে। তাছাড়া এক্ষুনি স্টমাক ওয়াস করতে হবে। ওকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপনি কি আসবেন? একবার দেখে আসতে পারেন।

মধুরা খুব অসহায়ভাবে বলল,

—যেতেই হবে?

—যাওয়াটা উচিত বলেই মনে হয়।

ওদের কথাবার্তার মাঝেই কৃষ্ণেন্দু সরে এসেছিল। আবীরাকে ও.টিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আধঘন্টা আগে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হচ্ছিল আবীরা যেন অর্ধেকের বেশি জীবনটা ওটিতে কাটাচ্ছে। মধুরাদির কথায় চমকে উঠল সে,

—ও আবার এরকম করবে— অবশ্য যদি বাঁচে।

—কী বলছ মধুরাদি।

—ঠিকই বলছি।

একটু ইতস্তত করে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল,

—কউড় অংকেলকে কি জানানো হয়েছে?

—না। একেবারেই জানাব। তখন অন্তত দুরকম চিন্তায় শেষ হতে হবে না মানুষটাকে।

—প্লিজ মধুরাদি। এরকমভাবে বোলে না। আর খারাপটাই বা ভাবছ কেন?

—খারাপটাকে খারাপই যে ভাবি কৃষ্ণেন্দু। আমাকেও জানতে দিল না। ও শেষ হয়ে গেল। হাতের শিরা কাটল...অ্যালকোহল জোগার করে স্ট্রং সিডেটিভস্ মিশিয়ে খেয়ে নিল...তবু জানাল না।

কৃষ্ণেন্দুর মুখে আর কোনো কথা আসছিল না। আবীরাদের পরিবারটা আর পাঁচটা পরিবারের মতো নয়। ওদের মা অলাদা থাকেন। দ্বিতীয় বিয়েও করেছেন। শাক্যই বলেছিল কথাগুলো। এই জটিল পরিবারটির মধ্যে আরও হয়ত কোনো বিষাক্ত জটিলতা লুকিয়ে আছে, যা সে জানে না। আবার মধুরাদি বলে উঠল,

—তুই চিত্রা আর পালককে খবরটা দিয়েদে। এসে দেখে যাক।

—এত অস্থির হচ্ছ কেন?

—আমি এত স্থির কোনোদিনও থাকিনিরে কৃষ্ণেন্দু।

—ওদের খবর দেবার মতো কিছু হয়নি। একটু চা খাবে?

—নাহ্। তুই বরং খেয়ে আয়। আর শাক্যকে একবার ফোন করবি? ওকে ভীষণ ভালোবাসতরে আবীরা। ভাইফোঁটায় কুট্টিদাকে...

কথাটা শেষ করার আগেই সম্বিত ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর। বলল,

—এখনও কন্ডিশান্ বলতে পারছিনা। চব্বিশঘন্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

বাই দ্য ওয়ে আপনি কি স্যারকে জানিয়েছেন?

—না,

—ভালোই করেছেন। আর একটা কথা, আপনাকে রাতে থাকতে হতে পারে। চিন্তা করবেন না। এখানে ব্যবস্থা

আছে।

কৃষেন্দু নার্সিংহোম থেকে যখন বেরুল তখন প্রায় সন্ধ্যা। কিছু না ভেবেই শাক্যকে ফোন করল। নট্ রিচেবল্ শুনবে জেনেও আবার ফোন করল। শাক্যর মোবাইল বলছে 'নট রিচেল্'। আবীরার অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। যদিও পাল্‌স বিট স্বাভাবিক হয়নি এখনও। অর্থাৎ সংকট থেকেই যাচ্ছে। আবীরা ও এখনও পর্যন্ত নট রিচেবেল। কৃষ্ণেন্দুর হঠাৎ মনে হলো, আজ যেন সে নিজেই নিজের ধরা ছোঁয়া বাইরে চলে গেছে। কোনো কোনো ভাঙন কি তবে সত্যিই বুঝিয়ে দেয় - কোথাও একটা কিছু অজান্তে গড়ে উঠছিল।

।। বারো।।

সম্বিতের চেম্বারে আজ বিশেষ ভীড় নেই। এই নার্সিং হোমটায় সে একমাস হলো আসছে। আগে সার্জিকাল কেস ছাড়া আসত না। ডঃ ঘোষালের প্রস্তাবটা যে এড়িয়ে যেতে পারেনি। ডঃ ঘোষাল তার থেকে সিনিয়ার হলেও ডঃ কউড়েরই ছাত্র। আজ অনেকবার ফোন করেছিলেন আবীরার কন্ডিশান জানতে। সন্ধ্যে ছ'টায় ও পি ডি তে বসে সম্বিত। আজও বসেছিল। দু-তিন জন রুগীকে অভ্যস্ত মনস্কতায় পরীক্ষা করল। দুপুর থেকেই আজ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। তাই ভীড়ও কম। কৃষ্ণেন্দুটা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথমে। পরে ভীষণ শান্ত হয়ে গেল ছেলেটা। বোধহয় সামলে নিল নিজেকে। অভিজ্ঞতা মানুষকে তার চরিত্রের বিমুখী করে তোলে অনেক সময়। ও পি ডিতে আসার সময় সম্বিত মধুরাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখল মধুরা একাই দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণেন্দুর কথা জিজ্ঞেস করাতে মধুরা বলল,

—বৃষ্টিটা একটু ধরেছে দেখে ওকে আমিই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে থেকেই বা কী করবে?

—তবু থাকত আপনার সঙ্গে।

—তাতে কিছু হেরফের হত না। আমার সঙ্গে কারোর থেকেই লাভ নেই। আবীরাটারও যে নেই সেটা বুঝতে পারিনি।

—এতটা নেগেটিভ ভাবছেন কেন? সবাই চেষ্টা করছে, যতটা খারাপ ভাবছেন সেরকম কিছু হবে না।

—না হলেই ভালো। আমার হাতে তো আর কিছু নেই।

—আছে বোধহয়। যাক্ গে; আপনি খেয়েছেন কিছু?

—দরকার হয়নি।

—আমি বুঝতে পারছি। খিদে পেলে একতলার বাঁদিকে চলে যাবেন, ওখানে একটা ক্যান্টিন আছে।

—থ্যাংক্স। তার দরকার হবে না।

সম্বিত আর কথা বাড়ায়নি। ও পি ডির সময় হয়ে গিয়েছিল। আজ তার মনটা ভালো লাগছিল না। বাইরে তখনও তুমুল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতিকি কি টের পায় মানুষের মনের আলোড়নকে? হয়ত পায়। রুগী দেখা শেষ করে ও যখন চেম্বার থেকে বেরল, তখন বৃষ্টিটা কমেছে কিন্তু আকাশ টা থমকে আছে। আজ সম্বিত বাড়ি ফিরবে না। খবরটা জানাতেই বাড়িতে ফোন করেছিল সে। চিত্রার সঙ্গেই কথা হলো। বাড়িতে সে কাউকে কিছু জানায়নি। কিন্তু চিত্রা জেনে গেছে। কৃষ্ণেন্দুই বলেছে বোধহয়। খুবই উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছিল চিত্রার গলাটা।

—দাদা, আবীরা বাঁচবে তো? আমি আর পালক যেতাম।

—এসে কী করতি?

—জানি না। কিন্তু বাড়িতে একদম ভালো লাগছে না। খবরটা যখন পেলাম তখন আর বেরোবার উপায় নেই। এত বৃষ্টি। রাস্তায় জল জমে গেছে। পালক জল ভেঙেই এসেছিল খবরটা শুনে। মা কিছুতেই রাজি হলো না আমাদের দুজনকে ছাড়তে।

—সেটাই স্বাভাবিক। তোরা বরঞ্চ কাল সকালে আসিস। আর এতো চিন্তা করিস না।

—ক্রাইসিসটা কেটেছে?

—পুরোপুরি নয়। রাখছিরে। মাকে বলে দিস।

আজকে তার মোবাইলটা খুব ব্যতিক্রমী ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। সকালবেলা বেজে উঠল। স্ক্রীনে অপরিচিত নাম্বার । কিন্তু তার পেশায় অপরিচিত বলে কিছু থাকে না। ফোনটা ধরামাত্র ওপাশের কণ্ঠস্বর তাকে ভীষণ অবাক করেছিল,

—ডঃ সম্বিত রায়? আমি মধুরা বলছি। আবীরা সুইসাইডাল অ্যাটেমট নিয়েছে। জানি না আপনি আসা পর্যন্ত সে থাকবে কি না। বাবা দিল্লী গেছেন আপনি কাইন্ডলি আসুন একবার।

—সে কী। আমি এক্ষুনি আসছি।

আর কোনো কথা হয়নি। সম্বিতের তবু খটকা লাগছিল মধুরা তাকেই কেন ফোন করল? ডঃ কউড়ের পরিচিত আরও অনেক ডাক্তারের সঙ্গে নিশ্চয়ই মধুরার পরিচয় আছে। অন্তত তার থেকে বেশি পরিচিত তারা মধুরার কাছে। এতক্ষণ খটকাটাকে সে তেমন বুঝতে চায়নি, সুযোগও পায়নি। কিন্তু এখন সুযোগ বুঝে খটকাটাই তাকে চেপে

ধরেছে। হয়ত আবীরার এই কাজটার পেছনে এমন কোনো কারণ আছে যা সম্বিতকে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল মধুরা। সম্বিত নিজে জিজ্ঞেস করবে না কিছু কিন্তু আবীরার ট্রিটমেন্টের জন্যই কারণটা জানা দরকার। এত ডেসপারেট অ্যাটেমন্টনিয়েছে মেয়েটা যে সারভাইব করলেও ও যে আবার এরকম করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবীরাকে সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করাতেই হবে। এই ব্যাপারটা মধুরাকে জানানো দরকার। নার্সিং হোমের ভিজিটিং আওয়ার অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। সম্বিত আবীরার কাছে এসে দাঁড়াল। অক্সিজেন, সেলাইন, ব্লাড নানারকম নালিকা প্রবাহ প্রাণপণে জীবিত রাখতে চাইছে এই জীবনটাকে। আই - সি - ইউ এর নীলচে আলোতে মেয়েটার মুখটা ভীষণ করুণ দ্যাখাচ্ছে। ওর উচ্ছল হাসি ভরা মুখটার সঙ্গে এই মুখটার কোনো মিলই খুঁজে পেলনা সম্বিত। চিত্রা, পালক, আবীরা একই বয়সী। এত অল্প বয়সে মেয়েটা কী এমন আঘাত পেল যে এরকম একটা মারাত্মক পদক্ষেপ নিল? আজকালকার জেনারেশনের পাল্‌সটাই বড্ড গোলমেলে মনে হয় সম্বিতের। অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে সম্বিত যখন মধুরার খোঁজে ভিজিটার্‌স লাউঞ্জটায় এল তখন দশটা বেজে গেছে। এক কোনের একটা চেয়ারে বসে আছে মধুরা। মধুরা কউড়কে ভীষণ ব্যক্তিত্বময়ী, গম্ভীর ও গভীর স্বভাবের মনে হয় সম্বিতের। কিন্তু আজকের মধুরার মধ্যে এর কোনোটাই খুঁজে পেল না সে। পাথরের শীতলতা ছেয়ে আছে মধুরার মুখটায়। সম্বিতকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল,

—কেমন আছে?

—একটু ভালো।

—আমাকে সান্ত্বনা দেবেন না প্লিজ।

—না, সেটা দিচ্ছি না। সত্যিটাই বললাম। তবে টেনশানটা এখনও থেকে যাচ্ছে।

—আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

—না, আমার আজকে নাইট আছে। আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা ছিল। অসুবিধে না থাকলে আমার চেম্বারে একটু আসবেন?

মধুরা যন্ত্রের মতো সম্বিতের চেম্বারে এসে বসল। চেম্বারটা একটা রিভলবিং চেয়ার, রুগী বসার দুটো কেঠো চেয়ার মাঝে গ্লাসটপ টেবিল, রুগীকে পরীক্ষা করার একটা সরু উঁচু বেড এবং মাঝারি মাপের একটা সোফা দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সম্বিত তার ঘূর্ণয়মান চেয়ারটিতে বসেছিল। কথাগুলো এ মুহূর্তে তার চেম্বারটার মতোই ছড়ানো ছেটানো হয়ে মনে ঘুরছে। মধুরা একইরকম ভাবলেশহীন হয়ে সোফাটার এক কোনে বসে আছে। পরিবেশটা একটু স্বাভাবিক করার জন্যই সম্বিত দুটো কফির অর্ডার দিল ফোনে। কফি আসা পর্যন্ত সে কথাগুলো বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সবক্ষেত্রে প্রফেশানাল যে হওয়া যায় না সেটা এই প্রথম তীব্রভাবে বুঝতে পারছিল সম্বিত। কফি দিয়ে গেল ক্যান্টিনের ছেলেটা। কফির কাপটা মধুরার সামনে রাখতে রাখতে সম্বিত বলল,

—কফিটা খেয়ে নিন। আবীরা ইনপ্রুভ করছে।

—ও আবার এরকম করবে জানেন?

—যদিও আমি জানি না কেন এরকম ঘটনা ঘটল, তবে একথাটা আমারও মনে হয়েছে। ওকে একজন ভালো সাইকাটিস্ট দেখাতে হবে। আপনি বললে আমি একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।

—তাতে লাভ হবে বলছেন?

—ক্ষতি হবে না। আর বুঝতেই পারছেন ওকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে আপনার ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

—এতদিন আমিও তাই জানতাম। আট বছর বয়স থেকে ওকে আমিই বড়ো করেছি। লাভ কী হলো বলুন? উল্টে ক্ষতিই হলো।

—এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে?

—আমি ভেঙে পড়িনি। সত্যি কথাটাই বললাম।

—কিছু যদি মনে না করেন, এই ঘটনার কারণ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে? যদিও প্রশ্নটা খুবই ব্যক্তিগত তবু জিজ্ঞেস করছি। সাইকায়াটিস্ট ডঃ সান্যালের কাছে তাহলে স্কিমটা বলতে পারি। এতে ওরই ট্রিটমেন্টের সুবিধে হবে।

সম্বিত এই প্রশ্নটার প্রতিক্রিয়াটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। মধুরার মুখটা নিমেষে বদলে গেল, চোখ দুটো জ্বলছে। সম্বিতের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে এক নিঃশ্বাসে বলে চলল,

—আবীরা আমার বাবার সন্তান নয়। রেবতী ও পুষ্পরাগ দত্তের সন্তান। ওর জন্মের সময় মা পুষ্পরাগকে বিয়ে করেননি, পরে করেছেন। বাবা আবীরাকে মার কাছে রাখতে দেননি। সে ডঃ অমরজিৎ কউড়ের পিতৃপরিচয়েই বড়ো হয়েছে। দুদিন আগে আবীরা বোলপুরে মার কাছে গিয়েছিল। পুষ্পরাগ দত্ত সেখানে ছিলেন। মি: দত্তের ওখানে থাকার কথাটা আবীরাই আমাকে বলেছিল। আমার ধারনা যে সত্যটা ওর কাছ থেকে এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটা কোনোভাবে বোলপুরেই ও জানতে পারে। আমাদের বাড়িতে অ্যালকোহল আসেনা। ওখানে আসে।

আবীরার ব্যাগ থেকে বোতলটা বেরিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বোতলটা বোধহয় সিল্‌ড্‌ ছিল না। তাই বোতলটা ফেলে দিলেও ওর ব্যাগে আমি অ্যালকোহলের গন্ধটা পেয়েছি। আর সঙ্গে একটুকরো কাগজ...তাতে লেখা, ''আমি কে?''।

একটানা এতগুলো পুরনো অবরুদ্ধ কথা বলার জন্যই বোধহয় মধুরা ভীষণ হাঁফাচ্ছিল। সম্বিত গ্লাসে জল নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বলল,

—সরি। আপনি একটু শান্ত হন। জলটা খান। আই অ্যাম রিয়েলি সরি। আমি আপনাকে হার্ট করার জন্য কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

মধুরা জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সোফায় বসে পড়ল। ওর মুখ চোখ একেবারেই স্বাভাবিক লাগছিল না। সম্বিত আবার বলল,

—আপনার এ মুহূর্তে ঠিক কী করতে ইচ্ছে করছে?

—মধুরা যে আর নিজেকে শক্ত খোলে ঢেকে রাখতে পারবে না, বুঝতে পারছিল সম্বিত। কিন্তু মেয়েটার ভেঙে পড়াটাও ভীষণ অবাক করে দিল সম্বিতকে। ও সোফাটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। শেষ প্রশ্নটা করা মাত্র মধুরা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে উঠল,

—আমি যে সবদিক থেকে হেরে গেলাম। ওকে নিয়েই তো পার করতে পারছিলাম সব হেরে যাওয়াগুলো, হারিয়ে ফেলাগুলো— মা, মৈনাক...

আর কথা বলতে পারল না মধুরা। সম্বিত শান্ত গলায় বলল,

—হার - জিতের বাইরেও অনেক কিছু থাকে মধুরা।

মধুরা একহাতে মুখ ঢেকে ফেলল। ওর শরীরটা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। দম বন্ধ হয়ে হবু দিনের অবরুদ্ধ কান্না তার শোধ নিচ্ছে। সম্বিত ওর পাশেই বসে পড়ল। এই আউটবার্স্টটা হওয়ার দরকার ছিল। সে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল কফি কাপটার দিকে। একটা চুমুকও দেয়নি। জলের গ্লাসটা হাতে ধরে রয়েছে কান্নার দমকে গ্লাস থেকে জল চল্‌কে ভিজিয়ে দিচ্ছে সোফা আর মেঝের খানিকটা অংশ। সম্বিত মধুরার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল। এই অবস্থায় তার ঠিক কী করা উচিত সে ভেবে পাচ্ছিল না। ঘরে মধুরার কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সম্বিত সোফাটা থেকে উঠে তার চেয়ারে বসতেই যাচ্ছিল। আচম্‌কা তার ডান হাতটা ধরে মধুরা বলে উঠল,

—প্লিজ সম্বিত, ওকে বাঁচিয়ে দাও। তুমি জান না ওর কিছু হলে আমি...

এবারও কথা শেষ করতে পারল না মধুরা। সম্বিতের হাতটা চেপে ধরে ওর কথাগুলো কান্নায় হারিয়ে যেতে লাগল। সম্বিত দেখল সে মধুরার পাশেই বসে পড়েছে। তার শার্টের ডান হাতটা ভিজে যাচ্ছিল। এই কান্নার সান্ত্বনা দেবার মেকী মনে হচ্ছিল। আবীরাকে যে সামলাতে পেরেছে এতকাল, আজ তাকেই সামলান যাচ্ছে না। যাওয়ার কথাও নয়। চিন্তার অতলে ডুবে যেতে যেতেও সম্বিত বুঝতে পাল মধুরা কখন যেন তার কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমের মধ্যে কেঁদে চলেছে। বারোটা নাগাদ যখন সে রাউন্ডে যাবে বল্‌ে ঠতে যাচ্ছিল তখন বুঝতে পারল মধুরাকে ছাড়িয়ে তার পক্ষে ওঠাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। তবু সম্বিত উঠল। খুব সাবধানে মধুরার মাথাটা সোবার একপাশে আলতো করে এলিয়ে দিল। ঘুমোক মেয়েটা। একটা কাগজে লিখল—

—''আমি রাউন্ডে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে কল করো।''

কাগজটা মধুরার হাতের মধ্যে গুঁজে সে রাউন্ডে গেল। আবীরার থেকেও আবীরার দিদিকে সামলান যে অনেক বেশি কঠিন সেটা খুব স্পষ্ট ভাবে টের পাচ্ছিল সম্বিত। এই প্রথমবার মধুরাকে সামলাতে গিয়েই বোধহয় তার মনে হচ্ছিল অগোছালো ডাক্তারি চেম্বারটা আর শুধুমাত্র চেম্বার রইল না।

।। তেরো।।

কৃষ্ণেন্দুর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলনা শাক্য। মোবাইলে প্রায় দুদিন ধরে টাওয়ার ছিল না। শীতের শেষে এবার বর্ষা নেমেছে। বর্ষায় এখানে মোবাইলে নেটওয়ার্ক প্রায় থাকেনা বললেই চলে। অবশেষে যখন টাওয়ারটা আসল কৃষ্ণেন্দুর ফোনটাও প্রায় তখনই আসল। রাত্রি নটা হবে বোধহয়। খবরটা শুনে শাক্য অনেকক্ষণ স্থবির হয়েছিল। বিশ্বাস করতে পারছিল না। ছুটকি । সেই ছোট্ট মেয়েটা এরকম একটা কান্ড ঘটিয়ে বসল।অনেক ভেবেও কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। ছুটকি কোনোকালেই তার কাজে কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। ছুটকিই একমাত্র সদস্য যে তাকে কুট্টিদাদা ডাকে। নাম ধরে দাদা ডাকলে ডাকটার মধ্যে যেন আন্তরিকতাটা থাকে না। সেই হাসি খুশি প্রাণবন্ত মেয়েটার কী এমন হলো? এর আগেও ছুটকি তার কাছে নানা কারণে বকুনি খেয়েছে। কিন্তু বকুনি খাবে জেনেও মেয়েটা তার কুট্টিদাকে সব বলত। ভীষণ বেশি কথা বলার জন্য ওকে সবাই বকত। শাক্য কখনও সেজন্য ওকে বকেনি। সে বোঝে ছুটকি যতই ফাজিল হোক ওর মনের গভীরটা কেউ কখনও জানতে পারবে না, যদি না ও

নিজে থেকে জানায়। হয়ত আপাত বাচালতা দিয়ে ওর মনটাকেই আড়াল করে রাখত ছুটকি। আবীরা যে দুবার প্রেমে ঘা খেয়েছে সে কথা মধুরাদিও বোধহয় জানে না। জানতে দেয়নি আবীরা। শুধু তার কুট্টিদাদাকে বলেছে। দ্বিতীয় প্রেমটা তো বেশ বিপদজনক ছিল। একটা বখাটে ছেলের প্রেমে পড়ে গেল ছুটকি। অনেক বুঝিয়ে তাকে সেই বিপদ থেকে সরিয়ে এনেছিল শাক্য। এই যে সে আবীরাকে ছুটকি ডাকে, ছুটকি তার সব কথা কুট্টিদাকে বলে, সেটা নিয়ে জঘন্য ধরনের ইঙ্গিত করত দিদি। শাক্য জানে ছুটকি সব বুঝতে পারত। কিন্তু পাত্তা দিত না দিদিকে। সেই ছুটকির কী হলো যে সে তার কুট্টিদাকেও বলতে পারল না। এর উত্তর একমাত্র ওর কাছেই আছে।

শাক্য যখন পরেরদিন নার্সিং হোমে ঢুকলো তখন এগারোটা বেজে গেছে। রিসেপশানে সম্বিতদার নাম বলতেই ওরা ওকে অপেক্ষা করতে বলল। রিসেপশানের পাশেই ভিজিটারদের বসার জায়গা। সেখানে দুটো চেনা মুখ দেখতে পেল শাক্য, চিত্রা আর পালক। শাক্য ওদের দিকেই এগিয়ে গেল। চিত্রা শুকনো মুখে বলল,

—আমাদের ঢুকতে দেয়নি এখনও। শুদু মধুরাদি একটু আগে গেছে।

—এখন কেমন আছে ?

—ক্রাইসিসটা কেটেছে। তবে...

—তবে কী?

—কোনো কথা বলছে না। বলতে পারছে না।

শাক্য আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। এটা যে অনুমান করেছিল। ছুটকি বেঁচে মধুরাদির সঙ্গে সম্বিতদাকে আসতে দেখে ওরা ওদিকেই গেল। মধুরাদি শাক্যকে দেখেই বলে উঠল,

—তুই একবার যা শাক্য প্লিজ। ও কোনো কথাই বলছে না। শুধু চেয়ে রয়েছে। আজ বাবা আসছে। মানুষটাকে যে কী বলব বুঝতে পারছি না।

—কিছু লুকিয়োনা মধুরাদি। কউড় আঙ্কেলকে কিছু লুকোনো যাবে না; আর সেটা তোমার থেকে ভালো কেউ জানে না।

সম্বিত পাশেই দাঁড়িয়েছিল। শাক্য জিজ্ঞেস করল,

—এখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে সম্বিতদা? এখনও তো আই সি ইউ তেই আছে।

—সেটা ঠিক। তবে তুই একবার দেখা করতে পারিস। বেশিক্ষণ নয়। এই অবস্থায় উত্তেজনা ভালো না। তোকে যেতে দেওয়াটা সেদিক থেকে রিস্কি।

মধুরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল,

—কিন্তু ওর কথা বলাটাও তো দরকার। নাহলে তো কিছুই জানা যাবে না। আর আমি জানি ওর কিছু বলার হলে একমাত্র শাক্যর কাছেই বলবে। কুট্টিদা ছাড়া আবীরার আর কোনো মানুষকেই এই অবস্থায় কিছু বলার নেই।

শাক্য শান্ত গলায় বলল,

—মধুরাদি ওর কিন্তু আগে শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া দরকার। আমি বরং বিকেলে দেখা করব।

—না। তুই এখনই যাবি। আপনি একটু ব্যবস্থা করুন সম্বিত।

সম্বিতদাকে দেখেও শাক্যর মনে হলো বেশ ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। সে যতদূর চেনে ডঃ সম্বিত রায়কে তাতে সম্বিতদা কখনই শৃঙ্খলা ভাঙার পক্ষে নয়। ভীষণরকম ডিসিপ্লিনড্। ছুটকিটা যেন সব ওলোট পালট করে দিল। শাক্য যখন আই সি ইউ তে ঢুকলো তখন আবীরা ঘুমে আচ্ছন্ন। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল শাক্যর। তারা নিজেরা তিন ভাই বোন। কউড় আঙ্গোলদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা এতটাই গভীর যে মধুরাদি, ছুটকিকে সে অন্য পরিবারের বলে ভাবতেই পারে না। তার নিজের দাদা - দিদির থেকে ওরা অনেক বেশি নিজের শাক্যর কাছে। ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পাল না শাক্য। বেরিয়ে এল। সম্বিতদা সঙ্গেই ছিল। বলল,

—ওর ঘুমটা এখন দরকার বুঝলি শাক্য।

—কেন এরকম হলো কিছু জান সম্বিতদা?

—সেটা আবীরা ছাড়া আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

—মধুরাদিও জানে না?

—জানে হয়ত। তবে সেটাকে আন্দাজ করা বললে ঠিক হবে।

—তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?

—ভাবছি। একটু টায়ার্ডও লাগছে। তুই বরং মধুরাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা। বিকেলে আসিস।

—চিত্রারাও কিছু জানে না?

—না, চিত্রা অন্তত কিছু জানে না। পালকের কথা বলতে পারছিনা, ও জানলেও বলবে না।

—কিন্তু এই অবস্থায় ডাক্তারের কাছে কিছু লুকোনো তো বোকামি।

—হয়ত তাই। কিন্তু পালকের কিছু জানা থাকলেও ওর পক্ষে ও ব্যাপারে ডাক্তারকে বলাটা বেশ অসুবিধাজনক।

—মানে? তুমি জান সব?
—জানি বলতে মধুরা যা আন্দাজ করেছে আমায় বলেছে।
—কী আন্দাজ করেছে?
সস্মিতদা হাসল। কিন্তু উত্তরটা দিল না। শুধু বলল,
—যাওয়ার সময় চিত্রাদের দেখে শুনে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিস। আমার ফিরতে দুপুর হবে।
দুপুরে খেতে বসে ভাত নাড়া চাড়া করে উঠে পড়ল শাক্য। একটা সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর বাবা নিয়মানুবর্তিতার বাইরে যায় না। বারোটা নাগাদ দুপুরের খাওয়া খেয়ে নেন। নিজের ঘরে ঢোকার আগে বাবার ঘরে একবার উঁকি দিল শাক্য। সত্তর বছরের শরীরটা ঝড় ঝাপটা সামলেও টান টান ব্যাপারটা রয়ে গেছে বাবার চেহারায়। যদিও এখন মুখটা খুবই বিষন্ন দেখাচ্ছিল। শাক্যকে লক্ষ্য করেছেন ডাকলেন তাঁর ঘরে। শাক্য বাবার খাটের একপাশে বসল। সে অনেক কথা জানতে চায়। বাবা নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু কুন্ডল সেনকে প্রশ্ন করার অনেকরকম পরিকাঠামো আছে, এবং সেটা সম্পূর্ণই মানসিক। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শাক্য নিতান্ত একটা সাধারণ প্রশ্ন করল,
—তুমি ঘুমোবে না বাবা?
—এই বয়সে আর ঘুম। কেমন দেখলি ছুটকিকে?
বাবাও ছুটকি বলেই ডাকেন আবীরাকে। আবীরাই একমাত্র মানুষ যে শাক্যর রাশভারি বাবার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ডাকেও বিচিত্র নামে— হালুম, জ্যেঠু। বাবা বলে উঠলেন,
—এরকম একটা ভয় আমার ছিল। আমি অমরকে অনেকবার বলেছি, সত্যি কখনও চাপা থাকে না। মধুমাকেও বলেছি, ওকে সত্যিকথাটা বলে দিতে। আচমকা কোনোদিন নিজেথেকে ও সেটা জানলে ফলটা মারাত্মক হতে পারে। হলোও তাই।
অবাক হয়ে চেয়েছিল শাক্য। তারমানে তার সন্দেহটা অব্যর্থ। বাবা জানেন সব। কী এমন ভয়ঙ্কর সত্য লুকিয়ে রেখেছিল সবাই, বাবা হয়ত কোনো এক নিশ্ছিদ্র যুক্তিতে গোপন করেছেন কথাটা। কিন্তু তাকে জানাতে আপত্তি কোথায়? শাক্য সরাসরি জিজ্ঞেস করল,
—সেই সত্যিটা কী বাবা?
—তোর রাগ হচ্ছে তো, কেন তোকে জানান হয়নি। কথাটা। ঠিক ভরসা পাইনিরে শাক্য। তুই কাউকে কিছু বলতি না, কিছু তোকে দেখে কেউ কেউ কিছু একটা সন্দেহ করতই।
—দিদিদের কথা বলছ তো?
—মধুমাকে যে তখন কীভাবে দেখেছি, তা তোর লক্ষ্য করার কথা নয়। সেই বয়সে তখনও পৌঁছসনি। হয়ত আন্ডার এস্টিমেনট করেছিলাম তোকে। বললে হয়ত...
—কথাটা কী বাবা?
—জেনে খুব একটা লাভ এখন আর নেই বোধহয়।
—ক্ষতির সম্ভবনাটা আছে। ছুট্‌কি যে আবার এরকম করবে না তার গ্যারান্টি কি?
—সেটা হয়ত নেই। কিন্তু তুই কি সেটা আটকাতে পারবি?
—অন্তত চেষ্টা করতে পারি।
বিকেলে নাসিংহোমে পৌঁছে গিয়েছিল শাক্য। ভেবে পাচ্ছিল না। আবীরাকে সে কী বলবে? কী -ই বা বোঝাবে? আবীরার জায়গায় সে থাকলে কী করত? কতটা স্পোটিং হওয়া যায় এসব ক্ষেত্রে। শাক্য আবীরার বেডের কাছে দাঁড়াল। মেয়ে টা শূন্য দৃষ্টিতে জানলার বন্ধ কাঁচের দিকে চেয়ে রয়েছে। খুব আলতো করে ওর মাথায় হাতটা রাখতেই কেঁপে উঠল আবীরা। চোখ দুটো ভিজে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শাক্য খুব আস্তে আস্তে বলল,
—ছুটকি, তুই একবার আমাকেও বলতে পারলি না?
অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে নিজেকে বোজাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল আবীরা,
—চেয়েছিলাম। পারলাম না। তোমার ফোনটা নট রিচেবল্ আসছিল।
—একটু অপেক্ষা করতি বাবু। সবসময় কি সবকিছু রিচেব্‌ল্ হয়?
—নিজেকে সহ্য করতে পারছিলাম না কুট্টিদা।
—তুই ছুটকি। তুই আবীরা। তুই একটা সম্পূর্ণ মানুষ, এটাই কি নিজেকে সহ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়?
—তখন যে সব কেমন গুলিয়ে গেল।
আবীরা তার ড্রিপ লাগান হাতটা তুলতে চাইছিল। শাক্য নিজেই ওর হাতটা ধরে চুপ করে বসে রইল। এই হাতটাকে ধরে সে মেয়েটাকে প্রায় হাঁটতে শিখিয়েছিল। এই হাতটা প্রতিবছর কপালে ফোঁটা দিয়ে তার আয়ু কামনা করে। আর আজ এই হাতটাই ক্ষত বিক্ষত শিরাগুলো নিয়ে পুরু ব্যান্ডেজের মধ্যে আটকে রেখেছে ওর প্রাণটুকুকে। শাক্যর খুব ভয় লাগছিল। ছুটকি চলে যাবে না তো? নার্স দুবার সতর্কবার্তা দিয়ে গেছে। আর বসার সময় নেই। শাক্য

দেখল ছুট্‌কি ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের জল তখনও গাল ভিজিয়ে রেখেছে। সে খুব সাবধানে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে উঠতেই ছুট্‌কি বলে উঠল,

—কুট্টিদা, দিদিকে বোলো ওকে আমি খুব ভালোবাসি।

—কুট্টি।

।। চোদ্দ।।

আজকাল ঋতু বদলগুলো কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। এবার শীতের শেষ হলো বর্ষা দিয়ে। তারপরেই আবার হঠাৎ গরম পড়ে গেল। বসন্তের কোনো নামগন্ধ নেই। ছোটোবেলায় স্পষ্ট টের পেত বসন্তকালটা পালক। আজকাল আর পায় না। হাতে গল্পের বই থাকা সত্তেও পড়তে ইচ্ছে করছে না। সত্যি কথা বলতে কী কিছুই করতেই ইচ্ছে করছে না। মনটা অস্থির থাকলে এরকমটাই হয় পালকের। অস্থিরতার কারণটা অবশ্যই খুবই স্পষ্ট। সামনের সপ্তাহে দিদিরা ইউকে চলে যাবে। কণিষ্কের কোম্পানীই ওকে পাঠাচ্ছে। তাই আজ সন্ধ্যেবেলা ওরা আসবে। দিন দুয়েক থাকবে। পালকের আর ভালো লাগে না। দিনে দিনে এই অস্থিরতাটা বাড়ছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পালক। তার কোথাও যাবার জায়গাও নেই। এখন চিত্রাটাও ব্যস্ত হয়ে গেছে। মাস খানেক হলো স্কুলের টিচারশিপে জয়েন করেছে। পরীক্ষা সেও দিয়েছিল; তবে তার হয়নি। হবার কথাওনয়। স্কুল সার্ভিসে পাবার মতো পরীক্ষা সে দেয়নি। সেটা নিয়ে সে অর্থে কোনো মাথা ব্যথা নেই পালকের। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে চান্সটা পেলে ভালো হতো। অন্তত অনেকটা সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখা যেত। বাধা বলে,

—ব্যস্ততা দিয়ে অনেকেই আসলে পালিয়ে থাকতে চায়।

—আমি পালাব না বাবা।

—সেজন্যই তো বললাম, জোর করে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করিস না। তাতে বিশেষ ফল হয় না।

বাবা সব বুঝতে পারে। হয়ত সেকারণে কিছুটা অপরাধবোধেও ভোগে। কিন্তু বাবার তো সত্যি কোনো অপরাধবোধ থাকা উচিত নয়। পালকের মনে হয় দিদির যে যে বোধগুলো নেই, সেগুলো তারা তিনজন নিজের মতো করে ভাগ করে নিয়েছে। কিন্তু তাতেই কী আর ভারসাম্য আসে না আসবে? মা, বাবা, সে সবাই কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে নিষ্ফল ভরসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে। সেদিক দিয়ে দেখলে চিত্রাটা সত্যিকারের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। যদিও স্কুলের চাকরিটায় চিত্রা খুব একটা খুশি নয়। খুব স্বাভাবিক। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রীর পক্ষে স্কুলটা হয়ত খুবই গন্ডীবদ্ধ জায়গা। তবু পালকের মনে হয় ওখানেই চিত্রাদের আসল জায়গা হওয়া উচিত, সেখানে মানুষের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অবশ্য তার মনে হওয়ায় কিছু যায় আসে না। কিসে যে কী যায় আসে তা বোধহয় কেউই জানে না। আবীরার ঘটনাটাও তো সে কথাই বলে। হঠাৎ কেমন বদলে গেল আবীরা। আজকাল খুব কম কথা বলে। পালক ইচ্ছে করেই ওকে দিয়ে জোর করে কথা বলায় না। তাতে বোধহয় ওর ট্রমাটা বাড়বে বই কমবে না। আর যতবার বলবে ততবার সেই একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবে ও। সেটা ওর পক্ষে ক্ষতির। যদিও আবীরার এই সিদ্ধান্তটার কারণ সে জানে না। জানার দরকারও নেই। দরকার থাকলে আবীরাই বলবে। তাছাড়া এখনও ওর কাউনসেলিং চলছে। পালক মাঝে মাঝে যায়, প্রায়ই ফোন করে, মধুরাদির সঙ্গেই বেশি কথা হয়। আজ একবার ওখানে গেলে মন্দ হয় না। অনেকটা সময়ও কেটে যাবে। কথাটা ভেবেই নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হলো পালকের। সে আবীরার জন্য নয়, নিজের সুবিধার জন্য যেতে চাইছে। না, পালক পালাবে না। তার নিজের যন্ত্রণাটা কি আবীরার থেকেও বেশি? আবীরার যন্ত্রণাটা কিসের সেটা সে জানে না, কিন্তু যেভাবে ও নিজেকে ও শেষ করতে বসেছিল তাতে মনে হয় খুব সিরিয়াস কিছু হবে। পালক অন্য কাউকেই এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। করবেও না। আবীরার ওই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন সম্বিতদা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

—তুই কিছু জানতিস পালক?

—না। আমি কীভাবে জানব? আর জানলে তোমাকে অন্তত বলে দিতাম। কারণ তাতে আবীরার চিকিৎসার সুবিধে হতো।

—আসলে ভাবছিলাম তোরা তো ওর ছোটোবেলার বন্ধু। কিছু হিন্ট যদি পেয়ে থাকিস।

—না, এ ব্যাপারে ও কোনো হিন্টই আমাকে দেয়নি সে। কিন্তু তুমি আমাকেই কেন জিজ্ঞেস করছ?

—কারণ তুই খুব ভালো অবজার্ভার। হিন্ট বুঝতেও পারিস আবার বুঝতে না দিতেও পারিস।

—সেটা চিত্রাও পারে সম্বিতদা।

—তোর মতো অতটা না হলেও পারে। ওকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোকেও করলাম। অত ক্ষেপে যাচ্ছিস কেন?

—অকারণ সন্দেহ করলে যে কেউ ক্ষেপেই যাবে। তাছাড়া তুমি নিশ্চয়ই সব জান। তাহলে এখন আর এই প্রশ্নের কারন কি?

—তোদের জিজ্ঞেস করে দেখছিলাম ওর মধ্যে কোনো টিপিক্যাল ডিসওর্ডার এর আগে লক্ষ্য করেছিস কি না।
—না। একেবারেই না।
—আচ্ছা বাবা, এবার ভাব করে নে। জানিসই তো ঝগড়া করতে আমি তোদের মতো ওস্তাদ নই।

সম্বিতদার মুখটা দেখে হেসে ফেলেছিল পালক। সম্বিতদা হয়ত ঠিকই বলেছিল, সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত কেমন করে যেন বুঝে যায়। যেমন আজকাল তার মনে হয় সেই ঘটনার পর থেকে মধুরাদির সঙ্গে সম্বিতদার বোধহয় একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। খুব ধীরে, কিন্তু গড়ে উঠছে কিছু একটা। তবে কি এক - একটা ভাঙন তার আড়ালে নতুন একটা কিছু গড়েও তোলে? হবে হয়ত। তবে সেটা ব্যতিক্রমে রাখাই ভালো। এরকম কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটে, সবার নয়।
—অ্যাই পালক। কী এত ভাবছিস?

অনন্যা কখন তার ঘরে ঢুকেছে বুঝতেই পারেনি পালক। খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে অনন্যাকে। নিশ্চয়ই বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছে। ওকে দেখে খুব ভালো লাগছিল পালকের। বেশ আছে অনন্যা। ওর আর পালকের স্ট্রিম একই ছিল। দুজনেই এইচ এস এর পর আর সাইন্সের ধারে কাছে যায়নি। ইংরেজী নিয়ে পড়েছে। এম এর ফাইনাল ইয়ার থেকেই অনন্যার বিয়ের দেখা শোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্যও তাতে বেশ খুশি। পরিস্কার বলত,
—আমার বাবা চাকরি বাকরি পোষায় না। প্রেম করার সাহসওনেই। বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করলে বিয়ে করে গুছিয়ে সংসার করব।

অনন্যা শাড়ি পরে এসেছে। বিয়ে ঠিক হলে এখনও অনেকে শাড়িটাকে ইউনিফর্ম করে ফেলে। পালক হাসছিল। অনন্যা ধমকে উঠল,
—হাসছিস কেন রে?
—এমনি। কবে সংসার পাতছিস?
—পয়লা বৈশাখ।
—বাহ্। তা তোর হবু বর কেমন? তোর মনের মতো তো?
—কী জানি বাবা। তবে কথা বলে খারাপ কিছু তো লাগে না।
—কথা হয় তাহলে।
—হবে না? রোজ ফোন করবে। এর মধ্যে লুকিয়ে দুদিন অভিসারেও গিয়েছিলাম।
—নীল শাড়ি পরেছিলি? বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন?
—না তো। কেন বলত?
—রাধা কিন্তু নীলবসনায় বর্ষায় অভিসারে যেত। পদাবলী তা-ই বলে।
—তুই আবার বাংলার ওই খটমট টপিকগুলো পড়ছিস না কি আজকাল?
—চিরকালই পড়ি। তুই বম্বে সিনেমাটার 'তুহিরে' গানটার পিকচারাইজেশানটা লক্ষ্য করেছিস?
—গানটা শুনেছি। দেখেওছি হয়ত। কেন বলত?
—নায়ক মানে দয়িতের আহ্বানে যখন নায়িকা সামাজিক সংস্কার ভেঙে ছুটে আসছে তার প্রেমিকের কাছে, তার বোরখাটা অঙ্কুশে আটকে ছিড়ে যাচ্ছে, সে তবুও উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে বোরখা ছাড়াই। মনীষা কৈরালার পোশাকটা নীল ছিল। পদাবলী বংলার নয়, মনের।
—তোর মতো অ্যানালাইজ করার চোখ আমার নেই বাবা। তবে কথাটা শুনে সিনটা দেখতে ইচ্ছে করছে।
—ডি ভিডিটা আছে আমার কাছে। নিয়ে যা।
—পরে নেব। এখন তোকে আমার সঙ্গে একবার আবীরার বাড়ি যেতে হবে। মা বলে দিয়েছে, এতদূর একা না যেতে।
—অত দূর কোথায়? বাসে গেলে একটানা চলে যাবি। আর অটোয় গেলে দুবার বদলাতে হবে। ঘন্টাখানেকের ব্যাপার।
—তোর যেতে আপত্তি আছে?
—না। তবে একবার ফোন করে গেলে ভালো হয়।
—কেনরে? আবীরার জন্য বলছিস?
—অনেকটা সেকারণেও বলছি। আবার অনেক সময় তো ওরা বাড়ি থাকে না। দাঁড়া, মধুরাদিকে মোবাইলে ধরি। কনফার্মড্ হয়েই যাওয়া ভালো।

পালকরা যখন আবীরাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে তখন ওর মোবাইলটা বেজে উঠল। বাড়ি থেকে ফোন। নিশ্চয়ই দিদিরা চলে এসেছে। বাধ্য হয়ে ফোনটা ধরল পালক।
—তুই কী রে। আজকেই তোকে বেরোতে হলো? জানিস আমরা আসব।

—আমি তো দূরে কোথাও যাইনি দিদি। আবীরার বাড়িতে এসেছি। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরব।
—তোর মতো এত ইনডিফারেন্ট আমি আর কাউকে দেখিনিরে পালক।
ফোনটা কেটে দিল পাখি। পালক মনে মনে বলল,
—ভাগ্যিস আমি ইনডিফারেন্ট। তাই বেঁচে গেলি বোধহয়।
অনন্যা জিজ্ঞেস করল।
—কিছু হয়েছে?
—না। দিদিরা এসেছে তো। আমি বাড়ি নেই বলে ভীষণ বকল। চল্।
অনন্যা হঠাৎ কী যেন একটা আবিষ্কার করে বলে উঠল,
—হ্যারে পালক। তুই ও বুঝি অভিসারে এসেছিস?
—মানে?
—তোর সালওয়ারটা নীল রঙের আর আকাশে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে।
—আমাদের স্কুল ইউনিফর্মটাও নীল ছিল। বর্ষাকালেও ওটা পরেই স্কুলে যেতাম। তার মানে কি আমরা সবাই স্কুলে অভিসারে যেতাম।

মুখে যাই বলুক, পালক বুঝতে পারছিল তার ভীষণ অস্থির লাগছে। কেন যে ওই গানটার পিক্চারাইজেশানটার কথা বলতে গেল। ওই কথাটা কণিষ্ককেই ও প্রথম বলেছিল। ভীষণ অবাক হয়েছিল কণিষ্ক। সাবলীল নাটকীয়তায় অনেক প্রশস্তি দিয়েছিল তাকে। কেন যে কথাগুলো ভোলা যায় ন? নিজেকে ভোলাবার চেষ্টায় বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সে। কিছুতেই স্বাভাবিক থাকতে পারছে না পালক। আবীরাদের ডোরবেলাটা বাজাতেই ভুলে গেল। শেষে অনন্যাই ডোরবেলটা বাজাল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। পালক ভীষণ চমকে উঠেছিল। আবার সেই এক ঘটনা। সে যখনই খুব খারাপ থাকে, অস্থির থাকে তখনই এই ছেলেটার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। এবং এই কাকতালীয় ঘটনাটা প্রায় ব্যতিক্রমহীন হয়ে উঠেছে। কখনও কৃষ্ণেন্দুদার দোকানে, কখনও চিত্রাদের বাড়িতে, আবীরেক দেখতে নাসিংহোম আর এখন আবীরাদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শাক্য।

।। পনেরো।।

স্কুল থেকে ফিরে খুব ক্লান্ত লাগছিল চিত্রার। যাতায়াতে সব মিলিয়ে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় লেগে যায়। সেটা গায় মাখে না চিত্রা। তার থেকেও অনেকদূরে থাকে বসুধারা। কিন্তু এবারের গরমটা সবার কাছেই কেমন যেন অচেনা। কলকাতার গরম মানে প্যাচপ্যচে ঘাম। এবার সেসব নেই। চারি দিকে যেন আগুনের হল্কা ছুটছে। আজও যখন সে স্কুল থেকে বেরিয়েছে নাক - মুখ জ্বালিয়ে লু বইছে তখনও। মা নুন - চিনি লেবু দিয়ে শরবত করে রাখে। ওটা খেয়ে একটু স্বস্তি পাওয়া যায়। স্নান সেরে নিজের ঘরে বসেছিল চিত্রা। একটু পরেই পালক আসবে। ওরা অনন্যার জন্য গিফ্ট কিনতে যাবে। আবীরা এসব ব্যাপারে কোনোদিনই ওদের সঙ্গে থাকে না। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে এখন আবীরার মধ্যেই ভীষণ ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। এখানে আসলে আগে হুল্লোড় বাঁধিয়ে দিতে। এখন চিত্রার সঙ্গেও সেরকম গল্প করে না। বরং বাবার সঙ্গে গাছপালা নিয়ে গল্প করে যায়। বলে কম, শোনে বেশি। এই যে চিত্রা ওদের বন্ধুদের মধ্যে সবার আগে চাকরী পেয়েছে, আগের আবীরা সেটা নিয়েই একটা গ্যাদারিং অ্যারেঞ্জ করে ফেলত। আজকাল ভীড় থেকে নিজেকেই সরিয়ে রাখে। অনন্যার বিয়েতেও যাবে কিনা সন্দেহ আছে। আবীরা সোশিওলজি নিয়ে পড়েছে। দাদার পরামর্শ মতো চিত্রা অনেকগুলো এন.জি.ও-র খোঁজ ওকে দিয়েছে। দেখা যাক মেয়েটা কী করে? দাদাই একদিন কথায় কথায় বলছিল, কিছুতেই নিজেকে ব্যস্ত না রাখলে ওর ডিপ্রেশানটা কাটবে না। আবীরার ব্যাপারে দাদাকে জিজ্ঞেস করেও কোনো লাভ নেই। চিত্রা জানে দাদা কোনো দিনই কিছু জানাবে না। তবু একটা জিজ্ঞেসা তার ভেতরে থেকেই যায়। নিছক কৌতূহল নয়, চিত্রা কিছুতেই ভাবতে পারে না একটা মানুষ কেন নিজেকে শেষ করতে চায়? জীবনটা কেন এত তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে? কথাগুলো পালককে বলেছিল চিত্রা।
—কেন করে মানুষ এরকম বল্ত? এতটা অবহেলা আসে কোথা থেকে?
পালকের উত্তরটা আরও ধাঁধার মতো মনে হয়েছে তার,
—হয়ত চূড়ান্ত অবহেলা থেকেই।
—মানে তুই বলছিস আবীরা...
—আমি আবীরার ব্যাপারে কিছু জানি না চিত্রা। আমি যেটা বলছি সেটা একটা জেনার‍্যাল সেন্স—ভেরি মাচ ইন জেনার‍্যাল।
—কিছু তোরই বা এরকম মনে হলো কেন?
—ভয় পেলি নাকি? ভয় পাসনা। আমি সেরকম কিছু করব না।

—না ভয়ের প্রশ্ন নয়, তোর কেন কথাটা মনে হলো তা-ই ভাবছি।
—খুব সোজা। প্রত্যেকটা মানুষই জীবনে একটা না একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবহেলা পায়—হঠাৎ করেই পেয়ে যায়। তখন একটা মারাত্মক আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তৈরি হয়। সেটা কীভাবে কাটাবে বা আদৌ কাটবে কী না সেটা প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা। তাই তার রিঅ্যাকশানটাও ডিফার করে যায়।
—তুই কি আজকাল সাইকোলজিও পড়ছিস?
—ওটা সবাইকেই পড়তে হয়, কোনো না কোনো ভাবে।

চিত্রার মাঝে মাঝে এখন মনে হয় সে কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। সূক্ষ্ম অনুভূতি গুলো তার মধ্যে আজ কাল আর কাজ করে না। আর পালক যেন দিনে দিনে আরও গভীর হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই একটা মারাত্মক ট্র্যাজেডি থাকার দরকার আছে। তা না থাকলে অতলস্পর্শী গভীর অনুভূতির জগৎ তার কাছে অধরাই থেকে যায়।

—কী রে? এখনও রেডি হোসনি?

পালক এসে গেছে। মেয়েটার অদ্ভুত সহ্যশক্তি। কিছুদিন আগেই পাখিদিরা এসেছিল। দিন দুয়েক থাকলও এখানে। পালক কিন্তু কোথাও পালল না। কী অদ্ভুত নির্লিপ্ত করে ফেলেছে নিজেকে। চিত্রা ওকে বলেই ফেলেছে,
—তুই কি আদৌ বেঁচে আছিস পালক? আমি হলে এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারতাম না।
—এইসব মুহূর্তগুলোতেই তো বুঝতে পারিরে, আমি ভীষণভাবে বেঁচে আছি। জানিস, দিদি সব জানত।
—কী বলছিস তুই? কী হবে তাহলে?
—কিছু হবে না। অন্তত কিছু যে হয়নি সেটাতো দেখতেই পাচ্ছি। আর হওয়ার কথাও নয়। ভয় পাওয়ার মতো কোনো কিছু কণিষ্ক ওকে বলেনি। বলেছে বোধহয় দিদিকে জেলাস করে পাবার জন্য কণিষ্ক আমার সঙ্গে প্রায় নাটক করছিল। প্রেমিকাকে পাবার জন্য তাকে জেলাস করতে হয় কখনও কখনও। সেটারই নাটক চলছিল। বয়সের দোষে আমারই নাকি উইকনেস তৈরি হয়ে গেছিল।
—তুই কিছু বললি না?
—বলে লাভ?
—এতটাই কি সহজ পালক?
—যতটা ভাবছিস, তার থেকেও বেশি সহজ। দিদিটিও আমার সিনেমাটিক। আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, ''তোকে খুব কষ্ট দিলাম।''—বোঝ।

পালক হাসছিল কথাগুলো বলে। ভীষণ নির্মম ছিল ওর হাসিটা। এটাও তো নিজেকে শেষ করা। হয়ত এই শেষ হওয়াটায় নার্সিং হোম, ডাক্তার, কাউন্সোলিং কিছুরই দরকার হয় না। এগুলোর একটাও কাজে লাগে না।

হাতিবাগান থেকে এরা যখন ফিরছে তখন পালক হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলল,
—চিত্রা, তুই কোইন্সিডেন্সে বিশ্বাস করিস?
—এটা কি ঠিক বিশ্বাস - অবিশ্বাসের বিষয়? যখন ঘটে তখন ঘটে।
—আর যদি বারবার একই কোইন্সিডেন্স ঘটে?
—তাহলে শব্দটা থেকে 'কো' টাকে বাদ দিতে হবে। কেন বলত?
—নাহ এমনিই বলছিলাম। বাড়ি যাওয়ার আগে তোর বাড়িতে আমাকে ঢুকতেই হবে, কৃষ্ণেন্দুদার কাছ থেকে ঠাকুমার ছবিটা নিতে।
—তো?
পালক হাসল। বলে উঠল,
—কেন যেন মনে হচ্ছে কোনো একজন বাড়তি মানুষের সঙ্গে দেখা হতে পারে, যার আদৌ তোদের ওখানে থাকার কথা নয়।
—কে?
—নিজেই দেখবি। আমার ইনটিউসান বোধহয় কিছু কিছু জায়গায় ভীষণ স্ট্রং। অবশ্য আসল জায়গায় একেবারেই কাজ করেনি।

চিত্রা তার এই খামখেয়ালি অদ্ভুতুড়ে বন্ধুটাকে একবার চেয়ে দেখল। পালকটা সত্যিই কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে আজকাল। এখন যে ও কথাগুলো বলল, সবটাই যুক্তিহীন বাজে কথা। কিন্তু এমনভাবে বলল যেন এর থেকে বিশ্বাসযোগ্য বক্তব্য আর হতে পারে না। যত্তসব বাজে চিন্তা ঘোরে ওর মাথায়। চিত্রা কতবার বুঝিয়েছে, পড়াশোনা করতে। তাতে মনটা ভালো থাকে। শুনে পালকের কী হাসি। বলে,
—আমার মনটা এতটাও খারাপ নয় যে তাকে ভালো সাজার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। আমি পড়ি, মনের খোরাকের জন্য। কাজের পড়া পড়তে ইচ্ছে করে না। মনে হয় সব কিছুকেই আমরা কেমন যেন শুধু ইউজ করতে

চাই। ইউজ করো, তারপর কাজ হলে ছুড়ে ফেলে দাও।

বিচিত্রসব ফিলোসফি দাঁড় করায় পালক। কিন্তু এভাবে ও কতদিন থাকতে পারবে? চিত্রাদের বাড়িতে ঢুকে পালক ওপরে গেল কৃষ্ণেন্দুদার কাছে ছবি আনতে। চিত্রা ওর দাদার ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। পালক কীকরে বুঝতে পারল? শাক্যদা বসে দাদার সঙ্গে গল্প করছে।

।। ষোলো।।

স্টাফরুমে ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি চলছে আজ সকাল থেকেই। নানা দরকার অ - দরকার, দুর্নীতি, চুরি, লাইব্রেরী ফান্ড — কোনও বিষয়ই বাদ নেই। মধুরা দু-একটা হ্যাঁ-না গোছের মৃদু বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই বলেনি। বলতে ইচ্ছে করেনি। প্রিন্সিপালের সঙ্গে সেকেন্ড হাফে মিটিং আছে। সেখানে কোন কোন প্রস্তাব রাখা জরুরি, সেই নিয়েই এই প্রহসন। যে যার স্বার্থ আগলে গলাবাজি করে চলেছে। আজ কোনো ক্লাস হবে না। এ হেন জরুরি মিটিং এর জন্য। ছেলে মেয়েগুলো কলেজে আসে, অনেকে বহুদূর থেকেও আসে ক্লাস হবে না। এই ব্যাপারটাই সহ্য করতে পারছিল না মধুরা। অনেক ক্ষণ পর সে একটু উঁচু গলাতেই বলল,

—আমার একটা প্রস্তাব আছে এবং সেটা কার্যকরী বলেই বোধহয় আমাদের মনে হওয়া উচিত।

শৈলেশদা গম্ভীরভাবে বললেন,

—সেটা তো আমরা থট্ রিড করে বলতে পারব না মধুরা। তুমি এখন থেকে একটা কথাও বলো নি।

—সুযোগ পাইনি শৈলেশদা। আপনাদের থটরিড করার ধৃষ্টতা করছিলাম।

—তোমার বক্তব্যটা কী?

—কলেজ ম্যানেজমেন্ট কমিটির যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকুক না কেন, ক্লাসবন্ধ করা যাবে না। এতে স্টুডেন্টের ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে ওদের ডিপ্রাইভ করার কোনো মানেই হয় না।

—তৃণা ওর ফ্যাশানের চুলটা সামলে বলে উঠল,

—ওদের সমস্যার কথা ভেবেই তো মিটিং অ্যারেঞ্জ করা হয় মধুরা।

শৈলেশদা ব্যাঁকা হাসি হেসে, অনাবশ্যকরকম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন,

—তোমার আইডিওলজি।

মধুরা উঠে পড়ল। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু জেনেও ও আর ওই নোংরা পরিবেশটায় বসে থাকতে পারছিল না। স্টাফরুমের বাইরে একটা বারান্দা আছে। সামনে বাগান। কলেজের বাইরেটা যতটা সুন্দর আসল চেহারাটা তার এক অংশ হলেও ভেতরে বসে থাকা যেত। মধুরা জানে ওর এই উঠে আমার জন্য দীর্ঘ জবাবদিহি করতে হবে। একটা নরম গলার ডাকে ফিরে তাকালো মধুরা। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে ছেলেটা। মধুরা ওর কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের তো বটেই, তার বাইরেও কলেজের বহু ছাত্র ছাত্রীর নাম জানে। নাম ও চেহারা যে কখনও ভোলেনা। এদের নিয়ে ও ইউ জি সি রেকোমান্ডেড্ সোশাল ট্রেনিং কোর্স করাচ্ছে। এই বয়সাটর মধ্যে এখনও কিছুটা হলেও একটা বিশুদ্ধি রয়ে গেছে, বিনষ্টি এখনও পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি ওদের। সিঁড়ির মুখে ওরা কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল।

কলেজ থেকে যখন একদল কচি - কাঁচা ছাত্র - ছাত্রী নিয়ে মধুরা বেরোয় তখন অনেকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আগে সে একা বা দু-একজন সহকর্মীর সঙ্গে বেরত। মধুরার মনে হলো আজও সে সহকর্মীদের সঙ্গেই বেরিয়েছে। একদল উচ্ছল প্রাণবন্ত সহকর্মী। আবীরা আনঅফিশিয়ালি এদের সঙ্গে যোগ দেবে সামনের সপ্তাহ থেকে। ইদানীং ও একটা এন. জি. ও জয়েন করেছে। তারা স্লাম-চাইল্ড নিয়ে একটা প্রজেক্ট করেছে। আবীরা বেশ আগ্রহ নিয়ে কাজটা করছে দেখে মধুরা এখন অনেকটা নিশিন্ত। চিত্রা দিয়ে গিয়েছিল এন জি ও গুলোর ঠিকানা, ফোননাম্বার। মধুরা জানে ওগুলো আসলে সম্বিত জোগাড় করে দিয়েছে। শুধু পাঠিয়েছে চিত্রার হাত দিয়ে। সেই দিন নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি মধুরা। সম্বিতকে কীভাবে যেন আঁকড়ে ধরেছিল। আবীরাকে হারাবার আতঙ্কে। হারাতে যে এত ভয় লাগে এর আগে কখনও সেটা মনে হয়নি ওর। এমন কি মৈনাককে হারিয়েও সে ঠিক ভয় পায়নি, কেমন যেন শূন্য মনে হয়েছিল নিজেকে। মৈনাক তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নিজের জীবন থেকে। মধুরা বুঝতে পারছিল মৈনাক খুব দ্রুত পায়ে তার জীবন থেকে সরে যাচ্ছে। একদিন শুধু বলেছিল মধুরা।

—আমি তোকে জিজ্ঞেস করব না মৈনাক তুই কেন আমায় অ্যাভয়েড করছিস? শুধু অবাক লাগছে ভাবতে, এতদিন তোর সঙ্গে থেকেও কীভাবে অ্যাভয়েড করতে হয়, সেটা শিখতে পারলাম না।

মৈনাক যেন একটা এনকাউন্টারের জন্য তৈরিই ছিল। বলল,

—দ্যাখ, মধুরা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। প্রেম ব্যাপারটায় তোর মতো আর কাউকে মানায় না। বাট্ ম্যারেজ ইজ নট্ ইওর কাপ অফটি।

—চমৎকার যুক্তি।

—যুক্তি নারে। আমরা বিয়ে করলে সাংঘাতিক ভুল করা হবে রে। তুই হয়ত এখন মানতে পারছিস না। পরে ভেবে দেখিস আমি ঠিক কথাই বলছি। তার থেকে সম্পর্কটা যেখানে সুন্দর থাকে, সেখানেই সেটাকে রেখে দেওয়াটা অনেক বেশি হেলদি।

—তুই স্ক্রিপ্ট রাইটার হলে পারতি।

—তোর নিজেরই ভালো লাগত না মধুরা।

—সেটা না লাগাই স্বাভাবিক। অন্তত তোর সঙ্গে ঘর বেঁধে আমার সত্যিই ভালো লাগত না।

মধুরা জানতে পারেনি তার পরের দিনই মৈনাক আর জাহ্নবী লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করেছে। যখন জেনেছে তখন আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করেনি। শুধু শাক্যর মুখে কথাটা শুনে ওর খুব শীত করছিল। ঘাড়টা এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল কারোর কাঁধে। বহু অধ্যবসায়ে সে নিজেকে দৃঢ় করেছে। ঘাড় এলিয়ে দেবার দরকার হয়নি। আবীরা সেই অধ্যবসায়ে এভাবে আঘাত নিয়ে আসবে সেটা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি মধুরা। যেন জ্যেঠু অনেকবার বলেছিলেন, আবীরাকে সত্যি কথাটা জানিয়ে দিতে। হয়ত তাঁর অভিজ্ঞ চোখে এই অশনিসংকেত অনেক আগে থেকেই পেয়েছিল। কথাটা শুনলে হয়ত সেই রাতে তার কাঁধ খোজার দরকার হতো না। নিজের ওপরই বিরক্ত হচ্ছিল মধুরা।

বাড়িতে ঢুকে একটু অবাক হলো মধুরা। আবীরা তাদের ব্যালকনিতে ছোটো ছোটো টবে ভীষণ অচেনা চারা গাছ লাগাচ্ছে। মুখটা একটা পরিতৃপ্তিতে ভরে আছে। অনেকদিন পর তার বোনটাকে আবার চেনা মনে হচ্ছিল। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল মধুরা,

—এই চারাগুলো কোথায় পেলিরে?

—কাকু দিলেন।

—কোন কাকু?

—চিত্রার বাবা। বিমল কাকু।

—এগুলো কী গাছ?

—নাম জানি না। কাকু বললেন, ওদের 'নাম - হারা' বললেই ওরা বেশি খুশি হবে। রবীন্দ্রনাথ শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

—কোন গল্পে জানিস?

—মনে ছিল না। পালক বলে দিল, 'বলাই'।

—ওদের দায়িত্ব কিন্তু তোর আবীরা। ওদের সুখ - দুঃখ, আনন্দ কষ্ট সব তোকেই বুঝতে হবে। পারবি না?

—আগে পারতাম না দিদি। এখন পারব। বাবা পেরেছে, তুই পেয়েছিস, আমিও পারব।

—কী পেরেছি?

—নাম হারা একটা জীবনকে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিতে।

—আবার।

—রাগছিস কেনো? নেক্সটউইকে আমি কিন্তু যাব তোর কলেজে। আজকে বসের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। শুধু একটা ফোটোগ্রাফার হলে ভালো হতো। সেটা ওরা প্রোভাইড করতে পারছে না এক্ষুনি। ফ্রিল্যান্সার কাউকে সঙ্গে নিতে বলেছে। ভাবছি কৃষ্ণেন্দুকে বলি।

—বল্। খুব ভালো কাজ করছে এখন। শাক্যই বলছিল। তবে ওর সময় হবে কি?

—সময় বার করতে হবে। ওকে তো আর ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস করতে হচ্ছে না।

—বলে দ্যাখ্।

—কুট্টিদাকে দিয়ে বলাই। তাহলে তাড়াতাড়ি রাজি হবে।

—আবার শাক্যকে টানছিস কেন? বেচারা জ্বরে বেহাল হয়ে আছে।

—জানি তো। একটু আগেই জলপট্টি দিয়ে এসেছি। ভীষণ বকেও দিয়েছি। বাবার প্রেসক্রাইব করা ওষুধগুলো ঠিক মতো খাচ্ছে না।

—তুই। জলপট্টি দিয়েছিস

—হ্যাঁ। তুই যেভাবে আমার জ্বর হলে জলপট্টি দিস, সেভাবেই দিলাম।

—জানিস দিদি, এন জি ওর ঠিকানাগুলো আসলে সম্বিতদা দিয়েছিল।

—জানি।

—তোর খুব ভালো বন্ধু, নারে?

—ঠিক বলতে পারব না। সম্বিত একজন সেন্সেব্‌ল্ মানুষ।

—কাকে?

—তোদের দুজনকে।

অন্যসময় হলে হয়ত মধুরা রেগে যেত। কিন্তু আজ তার ভালো লাগছিল। শুধু বুঝতে পারছিল না, ভালোলাগাটায় আবীরার হাসি আর সম্বিত মিশে যাচ্ছে কিনা।

।। সতেরো।।

কলকাতায় বসে বর্ষা উপভোগ করা যায় না, বরং দুর্ভোগ পোহাতে হয় অনেক বেশি। এমনকি জ্বরের ঘোরটাও এবার আর রোমান্টিক লাগছে না শাক্যর। মনটা অস্থির হয়ে আছে। কারণ একটা নয়, অনেকগুলো কারণ জট পাকিয়ে বিদ্‌ঘুটে করে রেখেছে মনটাকে। তার স্কুল এখন বানবাসিদের আশ্রয়স্থল। ওখানে থাকাটা খুব জরুরি ছিল। কিন্তু জ্বরটা সব গোলমাল করে দিল। এই অবস্থায় এখন সে একটি সম্পন্ন বাড়ির সাজান গোছান ঘরে জ্বরের বিলাসিতা নিয়ে শুয়ে আছে। আর ওখানে বুড়ো বাচ্চা বেঘোরে মরছে। খাবার নেই জল বিষাক্ত, চিকিৎসার অভাব— আশ্রয়হীন অসহায় মানুষগুলো কী ভীষণ যুদ্ধ করছে বেঁচে থাকার জন্য। প্রত্যেকবার সেই একই ছবি। তবু ওরা বাঁচে। অনেক কিছু হারিয়েও বাঁচবে। জীবনের মূল্যটা বোধহয় একমাত্র এই মানুষগুলোই বোঝে। তার মতো বাবু লোকেরা ওদের সাহায্য করতে পারে না। সেই ক্ষমতাও তাদের নেই। এটা বুঝে গেছে শাক্য। সম্বিতদা তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। সপ্তাহে দুদিন করে যাচ্ছে এখানে। এখন মাঝে কউড় আঙ্কেলও গেছিলেন কদিন সম্বিতদার সঙ্গে। কিন্তু শুধু ডাক্তার গেলেই তো হলো না, চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই ওখানে। সম্বিতদাই বলছিল,

—খুব হতাশ লাগেরে শাক্য। কিছুই করতে পারিনা।

—তবু ওরা বাঁচবে।

—বাঁচবে। কিন্তু আমাদের জন্য নয়। আমরা কিছুই করতে পারিনি। পারবও না বোধহয়।

—সেইজন্য হতাশ লাগছে বলছ?

—না। ওরা আর বোধহয় আমাদের বিশ্বস করতে পারছে না।

—আমরা কারা সম্বিতদা?

—আরবান ইউয়ট্‌স্।

ঠিকই বলেছে সম্বিতদা। এরমধ্যে একদিন কৃষ্ণেন্দুও গিয়েছিল। ওর কাছে এই সব সাবজেক্ট। তবে অবজেক্টটা কি ভুলে যাচ্ছে সবাই? এই যে রঙিন টিভিতে এত মর্মগ্রাহী ভিডিও, খবরের কাগজে ছবি, লেখা। সম্ভ্রান্ত রাজপথে বানভাসিদের জন্য মিছিল, প্ল্যাকার্ড আর কৌটো হাতে ওদের জন্য সাহায্য চাওয়া— এগুলোর আদৌ কোনো মানে আছে কি? শাক্যর বার বারই মনে হয় এগুলোর কোনোটাই দরকার ওদের নেই। আর যেটা দরকার সেটা দেবার মতো মানসিকতা শাক্যদের নেই। আবীরা ঘরে ঢুকেই টিভিটি বন্ধ করে দিল। হাতে ফলের রসের গ্লাসটা ধরিয়ে বলল,

—খেয়ে নাও।

—ইচ্ছে করছে নারে ছুটকি।

—আমারও অনেকদিন অনেক কিছু ইচ্ছে করেনি কুট্টিদা। এখনও সব ইচ্ছে করে না। তবু ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাই। কারণ সেটাই উচিত বলে মনে হয়।

—কেনরে আবার ওই কথা বলছিস? মন খারাপ লাগছে?

—হ্যাঁ

মাথাটা ধরে আবার বসে পড়ল শাক্য। এই বোকা মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে তারা?

—কেন এটা হতে দিলি ছুটকি? আগে থেকেই যখন আঁচ পাচ্ছিলি?

—আমার একার জন্য যদি অনেকগুলো মানষের উপকার হয়, তাহলে না হতে দেবারই বা কী আছে?

—'ইমোশানাল পুল' বলে একটা কথা আছে, জানিস নিশ্চয়ই।

—কিন্তু তুমিই ভেবে দ্যাখো...

—এটা সিনেমা নয় ছুটকি। তোর কী ধারণা যে লোক এতটা নোংরা সে তোর সোকল্‌ড্ সমাজ সেবায় প্রাণ ঢেলে দেবে?

—চাকরিটা ছেড়ে দেব?

—আবার জিজ্ঞেস করছিস? এখনই একটা চড় মেরে বেরিয়ে এলিনা কেন?

—আমার তখন নিজের কথা মনে হয়নি। ইনফ্যাক্ট মনে হয় না।

—সত্যি কথা বল্— লোকটা তোকে রেপ করেনি তো?

—না অতটা বাড়াবাড়ি করেনি। হি টাচড্ মাই লিপ্‌স, দেন্...প্লিজ কুট্টিদা ইউ আর কোয়াইট ম্যাচিওর্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট অ্যাবিউজমেন্ট মিন্‌স্।

—সেটা তুই জানিস না? আমি কালই লোকটার সঙ্গে দেখা করব।
—এতো এক্সাইটেড হয়োনা। আই প্রমিস। আমি এরকম আর করব না। চাকরিটাও ছেড়ে দেব।
—মধুরাদি জানে?
—না।
—এত রেগে যাচ্ছ কেন? তুমি তো জান আমার মধ্যে একটা টিপিক্যাল্ ডিসঅর্ডার আছে।
—সেটা আমাদের সবার মধ্যেই কম বেশি তাকে। আমি মধুরাদির সঙ্গে কথা বলব।
—না। দিদিকে কিছু বলো না প্লিজ। ও খুব হার্ট হবে।
—তুই আমায় খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিস ছুটকি। এখনও দিচ্ছিস।
—বল্লাম তো, আর কখখনো হবে না। আমি তো কখনও প্রমিস করিনা, এখন করছি। তোমাদের আমার জন্য আর কোনোদিন ভয় পেতে হবে না। যা বলবে শুনব।
—ঠিক তো?
—ঠিক।
—তোর ইচ্ছেগুলোকে দিয়ে আগে নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তোল।
—তাতে কী হবে? পারব কিছু করতে? আমার একার পক্ষে কতটা করা সম্ভব? ওই বস্তিটায় আমি একা গেলে কোনো লাভ আছে? কোনো ভাবেই ওদের উপকারে আসবে না। এই যে বাসন্তি ক্যানিং এ বন্যায় মানুষগুলোর বেহাল অবস্থা, আমি একা সেখানে কী কাজে আসব? ফাইনানশিয়ালিতো নয়ই, অন্য কোনোভাবেই কাজে আসব না।
—পারবি। কাজেও আসবি। দুজনের দলকে দুশ জন করতে একটু সময় তো লাগবেরে পাগলি।
—দু'জন? ও:হো। তুমিও আমার দলে।
—নারে, আমরা মানুষের দলে হবার চেষ্টা করছি।
—মুহূর্তের মধ্যে টেবিল থেকে ফলের রসের গ্লাসটা শাক্যর দিকে এগিয়ে ধরে আবীরা বলল,
—তাহলে ফলের রসটা খেয়ে নাও।
—জ্বালালি। কিন্তু প্রমিসটা যেন মনে থাকে। তানাহলে ইউ নো মি।
—আবার বকছ কেন? তুমি তো আমার 'নাম - হারা' গাছগুলো দেখনি নি। কী সুন্দর অল্প করে পাতা গজাচ্ছে।
—'নাম-হারা' গাছ। বলাই।
—এমা, পালকও ঠিক এভাবেই বলেছিল।

।। আঠারো।।

এবার পুজোটা বড্ড তাড়াতাড়ি। এসময়ে দুর্গা পুজো ঠিক যেন মানায় না। যদিও এখন অক্টোবরের শেষেও রীতিমতো গরম থাকে, তবু ওই সময়টাতেই যেন পূজোটা ঠিকঠাক খাপ খায়, সব কিছুরই একটা আবহ থাকে বলে সম্বিতের ধারনা। এই যে, গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে লোকে প্রচন্ড উৎসাহে পূজোর কেনাকাটা করছে, এটাও একটা আবহ তৈরী করছে, কিন্তু অকাল বোধনটা সত্যিই এবার অকালে আসায় আবহটা মানাচ্ছে না। যদিও মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবমুখীনতাটাকে এই মুহূর্তে অ্যাপ্রিশিয়েট না করে পারল না সম্বিত। গড়িয়ার দিকে একটা দোতলা বাড়ির খোঁজ দিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। বাড়িটার লাগোয়া একটু জমিও আছে। বাবার পছন্দ হয়েছে। দামটা অনেকটাই তার সামর্থ্যের বাইরে। তবু বাড়িটা হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করছিল না। এখন বাড়ি ঘরের জন্য ব্যাঙ্কলোন পাওয়া খুব একটা ব্যাপার নয় এবং সেটা অনায়াসেই পেয়ে যাবে সম্বিত। তবে তার মাসিক আয়ের অনেকটাই যাবে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধে। চিত্রা শুনে বলেছিল,
—বাড়িটা বাবা - মাকে একবার দেখিয়ে আন দাদা। তাছাড়া তুই যে চিন্তাটা করছিস, সেটার থেকে অনেক কঠিন সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি, তাই না? ততটা অসুবিধে হবে না।
—জানি। আসলে স্বাচ্ছন্দ্য একটা নেশা, ছাড়ব ছাড়ব করেও ছাড়া যায় না।
—কিন্তু এটাতো একটা প্রয়োজন দাদা। মাথার ওপর নিজস্ব ছাদ তৈরি করাটাকে শুধু স্বাচ্ছন্দ্য বোধহয় বলা যায় না।
— কী জানি। যাক্‌গে তুই তাহলে কলেজের দিদিমণি হয়ে যাচ্ছিস?
—দাঁড়া। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।
—তোর সব ব্যাপারে অকারণ টেনশান কেন বলত?
—কোথায় আবার টেনশান করছি।
—করছিস। হ্যাঁরে, তোর দেখতে ইচ্ছে করছে না বাড়িটা?
—ওমা। করবে না কেন? বাবা মার প্রায়োরিটি আগে, তাই বললাম ওঁদের দেখিয়ে আন।

সবারই পছন্দ হয়েছে বাড়িটা। বাড়ির বর্তমান মালিক ব্যাচেলার। কৃষ্ণেন্দুর পরিচিত। তিনি বাড়ি বিক্রী করে মুম্বাই চলে যেতে চাইছেন। সে অর্থে বাড়িটা নতুনই, বছর তিনেক আগে বানানো। কিছু কাজ অবশ্য নিজেদের সুবিধের জন্য করিয়ে নেবে সম্বিত। বাড়িতে ও রুগী দ্যাখে না। তবু চিত্রা একটা ঘর চেম্বার করার জন্য বলছিল। রাজি হয়নি সম্বিত। বাড়িটাকে হাসপাতাল করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। চিত্রাটা একটু বেশিই বাস্তববাদী। অতটা না হলেও ক্ষতি ছিল না। মা বোধ হয় সবথেকে বেশি খুশি হয়েছে। বাবার মুখে পরিতৃপ্তি থাকলেও কী একটা পিছুটান যেন বাবাকে আটকে রেখেছে। বোধহয় তাদের ভাড়া বাড়ির মায়াটা। সম্বিতেরও যে খারাপ লাগছে না, তা নয়। কিন্তু একটা বাসস্থানের একেবারে নিজস্ব আশ্রয়ের প্রয়োজনটাকে যে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। প্রভামাসি তো শুনেই কেঁদে ফেলল,

—তোমরা কি আর আমাদের ভাড়াটে দিদি? কতগুলো বছর একসঙ্গে কাটালাম। নিজের মানুষকে কি আর ছাড়তে ইচ্ছে করে।

মা সান্ত্বনা দিচ্ছিল,

—আরে দাঁড়াও প্রভা। বললেই কি আর যাচ্ছি। এখনও কত ঝামেলা মেটাতে হবে। কাগজপত্র তৈরি করতে ঢের সময় লাগবে। তাছাড়া, নিজের মানুষ দূরে থাকলে পর হয়ে যায় নাকি?

প্রভামাসিকে বোঝানো যায়নি। এই কষ্ট, এই কান্নাগুলো আছে বলেই বোধহয় এখনও সম্পর্ক বলে একটা কিছু রয়ে গেছে। হয়ত এভাবেই সম্পর্ক থেকে যায়, থেকে যাবে। জ্যামে ট্যাক্সিটা অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাঁফধরা ভ্যাপসা গরম পড়েছে আজ। সম্বিত সাধারণত ট্যাক্সি পছন্দ করে না। বাসে ট্রামে মেট্রোয় সে অনেক বেশি সাবলীল। তবে প্রয়োজনটা মাত্রাগত দিক থেকে অতিরিক্ত হয়ে গেলে ট্যাক্সি নিতেই হয়। আজ অবশ্য তার ট্যাক্সি যাত্রাটা হঠাৎ মনের খেয়ালে। তাকে গাড়ি কেনার কথা অনেকেই বলেছে। এড়িয়ে গেছেও। তবে সে নিশ্চিত নয় এড়িয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা কতদিন ধরে রাখা যাবে। ডঃ কউড় পেরেছেন। কিন্তু সবাই তো আর ডঃ কউড় হতে পারবে না। এবার বর্ষায় সে স্যারকে নিয়ে শাক্যর ওখানে গেছিল। বন্যায় তছ্নছ্ হয়ে গেছে জায়গাটা। এখানকার মানুষের থেকেও নিজেকে বেশি অসহায় লেগেছিল ওর। ওই অবস্থাতেও তার স্যার ডঃ কউড় শিখিয়ে দিলেন অধ্যবসায় কী? চিকি?সার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, অকাতরে মানুষ মরছে— সেখানেও ডঃ কউড় তাকে যেন নতুন পাঠ পড়িয়ে দিলেন, তার পেশা একটা সাধনা। এতটা মগ্ন হতে পারবে কি সম্বিত? উত্তর পায়নি সে। এরকম আরও একটা উত্তর বেশি কিছুদিন ধরে সে খুঁজে চলেছে, প্রত্যাশা করে চলেছে। যদিও এই বিশেষ উত্তরটার প্রশ্নটাই ওর ঠিকমতো তৈরি হয়নি। তবুও একটা প্রশ্ন আছেই এবং সেটা মধুরার কাছে। অগোছালো প্রশ্নটাকে সে ক্রমাগত গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। মধুরা স্বেচ্ছায় সেদিন তাদের পারিবারিক গোপন তথ্যটা তাকে বলেনি, প্রয়োজনবোধ করেছিল বলেই বলেছিল। মধুরার ওইদিনের কথাবার্তায় সে একটা নাম শুনেছিল— মৈনাক। জাহ্নবীর বর মৈনাক যে একটি অতুলকীর্তি স্থাপন করেছে সেটা বহু চর্চিত আলোচনায় সম্বিত জানে। শুধু জানত না, তার ফলটা এতটা সুদূরপ্রসারী। মধুরা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, ধীর - স্থির তবু সেদিন নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। নাপারাই স্বাভাবিক। তবু মৈনাক নামটা সম্বিতকেই শুনতে হলো। তথাকথিত প্রয়োজন বোধের বাইরে ওই নামটা আটকাতে পারল না মধুরা তার কাছে। প্রশ্নগুলো অগোছালো হলেও এখানেই তৈরি হচ্ছিল ওর মনে। এটা কি শুধুই মধুরার বিহ্বল কথাগুলোর মধ্যে একটা? শুধুই কি প্রয়োজনবোধ? নাকি বাবার প্রিয় ছাত্র হিসেবে এই নির্ভরতা তার প্রাপ্য? সবচেয়ে বড়ো কথা, এই সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত উত্তরগুলো সম্বিতের ভালো লাগছে না। কারণটা তার কাছে স্পষ্ট। এই বয়সে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা পোষায় না। ওই ঘটনার পর মধুরা তাকে দেখলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। বার কয়েক ফোন ও এস এম এস করেছে মধুরা। প্রত্যেকটাই ভীষণ ফর্মাল। কিন্তু ওই ফোন আর এস এম এস এর মধ্যে দিয়ে একটা প্রত্যাশা বেখাপ্পা ধরনের বোধ তৈরি করে ফেলেছে সম্বিতের মধ্যে— সে নিশ্চিতভাবে মধুরার প্রেমে পড়েছে। ব্যাপারটার সঙ্গে একটা অস্বস্তি থাকলেও ভয়ঙ্কর দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনুভব করেনি সম্বিত। তাতে লাভ নেই, সত্যিটাকে এড়ানো যায়নি।

বাড়ি পৌঁছে সম্বিত স্নান করতে ঢুকে গেল। বাড়িতে কারা যেন এসেছে। আবীরার গলাটা শুনতে পেয়েছে সে। চিত্রার ঘর থেকে হৈ -হট্টগোল কানে আসছিল। কিন্তু আজ যে তার একটু নৈঃশব্দের প্রয়োজন ছিল। নিজের ঘরে এসে আলো না জ্বালিয়েই শুয়ে পড়ল ও। অন্ধকারের একটা অদ্ভুত ছায়াখেলা আছে, অনেকটা মানুষের মনের মতো। ডিভানটাতে শুয়ে সেটাই ভাবছিল সম্বিত। চিত্রার ঘর থেকে তখনও হাসির শব্দ আসছিল। বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা জমেছে। চিত্রা খুব একটা হুল্লোড়ে নয়। মাঝে মাঝে এরকম আড্ডা দিলে পারে, মন ভালো থাকে। তাহলে আজ বোধহয় সত্যিই মন ভালো করার মতো কোনো কারণ ঘটেছে। চিত্রা কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে গেছে? নাহ্। তাহলে সে সবার আগে ঘরটা দাদাকেই দিত। তাহলে হবে কিছু একটা। মার কথায় সম্বিতের অন্যমনস্কতা কেটে গেল,

—অন্ধকারে ভূতের মতো শুয়ে আছিস কেন? শরীর খারাপ নাকি?

মা আলো জ্বেলে ওর কপালে হাত রাখল। বড্ড ভালো লাগছিল সম্বিতের, সত্যিই যদি শরীরটা খারাপ

হতো। ছোটোবেলাকার মতো মার হাতটা, ছোঁয়াটা লেগে থাকত কপালে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বলল,
—চুপ করে শুয়ে আছিস কেন রে?
—এমনিই। একটু টায়ার্ড লাগছে।
—তা তো লাগবেই। এত পরিশ্রম যাচ্ছে কদিন ধরে।
—আমি একটু ঘুমোই। খাবার সময় ডেকে দিও।
—ওমা। আজ নাকি তোরা বাইরে খাবি?
—আমরা।
—হ্যাঁ, চিত্রা, পালক, আবীরা - সবাইতো তা-ই বলল।
—ওরা যাক। আমি বাড়িতেই খাব।
—তা বললে হয়, বাচ্চামেয়েগুলো কতক্ষণ তোর জন্য বসে আছে।
—আগে বললেই হতো, তখনই না করে দিতাম।

আরেকটা গলার স্বরে চমকে উঠল সম্বিত। মা মধুরার কথা তো বলল না। যদিও ও 'বাচ্চা মেয়ের' দলে পড়ে না। সম্বিত উঠে বসে পড়েছে। মধুরা মাকে বলছে।
—থাক না মাসিমা। উনি হয়ত ক্লান্ত। তাছাড়া সত্যিই তো উনাকে আগে জানানো ইচিত ছিল।
—তুমি থাম তো। ও ওইরকমই ঘরগুনো।

কথাটা বলতে বলতে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সম্বিত টের পেল ওর জট পাকান প্রশ্নগুলো আবার গলার কাছে আটকে আছে। ওই দিনের পর সম্বিত সম্বোধনটা বদলায়নি,
—তুমিও আছ তাহলে ওই বিচ্ছুগুলোর সঙ্গে।
—অবশ্যই। ওদের ছাড়া আমার চলে না যে। আমি উঠি? আপনি বরং রেস্ট নিন।
—মা 'ঘরকুনো' বলে মিথ্যে অপবাদটা দিল বটে তবে আমি রেস্ট নিতে খুব একটা অভ্যস্ত নই। তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি আসছি।
—কেন শুধু শুধু নিজেকে জোর করছেন সম্বিত?
—আমি নিজেকে জোর করিনা। তুমি করো বোধহয়। কথাটা রুড বলে ফেললাম। কিন্তু বলেই যখন ফেলেছি তখন সরি বলে দুর্ব্যবহারটাকে ঢাকার চেষ্টা করছিনা।

সত্যিই মধুরার মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। মধুরা বোধহয় একটু ব্যঙ্গ করল,
—তবে তো আপনি ভীষণ লাকি। আপনার হয়ত নিজেকে জোর করার মতো সিচুয়েশানে পড়তে হয়নি কখনও।
—মধুরার গলায় আওয়াজটা প্রায় শুনতেই পাচ্ছিল না সম্বিত,
—আমি খুবই লজ্জিত সম্বিত, সেদিনের ব্যবহার, সেদিনের কথাবার্তার জন্য।
—কেন বলো তো, তুমি তো আমায় গালমন্দ কিছু করোনি। হঠাৎ এরমধ্যে লজ্জিত টজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।
—আমি ওভার রিঅ্যাক্ট করছিলম।
—না। তোমার লজ্জার কারণটা হলো, তুমি সেদিনই একবারের জন্য নিজের মতো হয়েছিলে। এখন তাই নিজেকে আরও বেশি গুটিয়ে নিচ্ছ। এবং বলতে বাধ হচ্ছি এই কারণটার জন্য আমার বেশ খারাপ লাগছে। দুঃখ হচ্ছেও বলতে পারব।
—কিন্তু আমার পক্ষে এটাই সবচেয়ে কমফর্টেব্‌ল্ 'আপনি' বলাটা না নিজেকে গুটিয়ে রাখাটা।
—বোধহয় দুটোই।
—বোধহয় — মানে তুমি নিশ্চিত নও। ভেবে দেখো, অনেকসময় অভ্যস্ত কমফর্টের বাইরে পা রাখতে ভালো লাগে।
—এটা কি আপনার প্রেসক্রিপশান?
—একটা সাজেশান।
—এই সাজেশানটার আমার দরকার নেই।
—আছে?
—কেন শুধু শুধু জটিলতা ডেকে আনছেন?
—দরকার বোধ করছি, তাই। যাক্‌গে। রেস্টুরেন্টে খেতে যাব তো সবাই মিলে? একটু সাজ গোজ করে আসি। এই মিনিট দশেকের অপেক্ষাটা তুমি করতে পারবে না?
—মধুরা হাসতে হাসতে বলল,
—অন্তত ডাক্তারের সাজ দেখার জন্য সেটা তো পারতেই হবে।

—আর্য্য অনেক কিছুই পারতে হবে। শুধু তোমাকে নয় মধুরা, আমাকে আমাদের সবাইকে।

মধুরা ওর স্মিত হাসিটা মুখে ছড়িয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা নিজেও জানে না, ওর ব্যূহরচনা ভেঙ্গে পড়েছে। এরা কেন যে বোঝে না, জীবনকে জোর করে আটকে রাখা যায় না। সে তার ব্যাপ্তি খুঁজে নেবেই। সম্বিত হয়ত মথুরার ক্ষেত্রে আর একটা অণুঘটক এবং অবশ্যই ধনাত্মক অনুঘটক।